গোলাপের কাঁটা

আব্দুস সালাম মিতুল

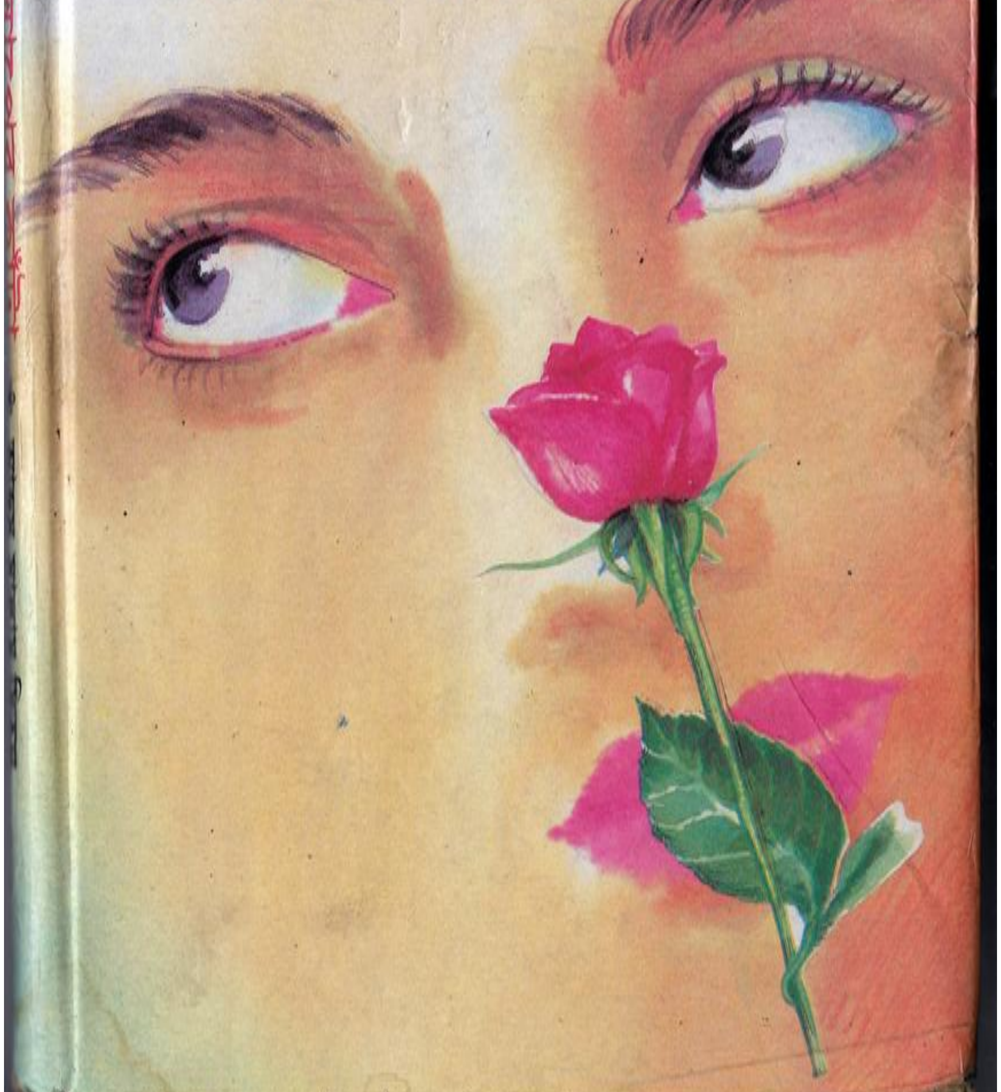

যারা অশ্লীল নোংড়া ও বৃথা গল্প কাহিনী দিয়ে মানুষদের পথভ্রষ্ট করে শেষ বিচারের দিনে তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক কঠোর শাস্তি ।

— (আল কোরআন)

উৎসর্গ

দিবা রাত্রি অহর্নিশি যাদের স্মৃতির উত্তাপে আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে
সেই-
স্বপ্না, স্বপন ও রত্নার হাতে-

প্রকাশক
সিরাজুল আলম তরফদার
তরফদার প্রকাশনী
২/৩ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : ৩০শে অক্টোবর ১৯৯৪
দ্বিতীয় প্রকাশ : ১লা ডিসেম্বর ১৯৯৪
তৃতীয় প্রকাশ : একুশে বইমেলা ১৯৯৫
চতুর্থ প্রকাশ ১৯৯৫

প্রচ্ছদ
সমর মজুমদার

সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

কম্পোজ
আশা কম্পিউটার
৪৩৫/ক ওয়ারলেস রেল গেইট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণে
হক্কা মুদ্রণ
ওয়ারি, ঢাকা।

মূল্য
নিউজ : ৪০.০০ টাকা
সাদা : ৫৫.০০ টাকা

ভূমিকা

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে আলীশানে শতকোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি এ জন্যে যে, তিনি আমাকে **"গোলাপের কাঁটা"** নামক উপন্যাসটি লেখার তওফিক এনায়েত করেছেন। শতকোটি দরুদ ঐ মহান মানবতার মুক্তির দূত নূরে মোজাস্সাম শোষিত নিপীড়িত ও নির্যাতিত জনতার মুক্তির দীশারী জনাবে মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (দঃ) এর উপর।

জীবন নিয়ে উপন্যাস- উপন্যাস নিয়ে জীবন নয়। আল্লাহর নাজিল করা অহীর মতো উপন্যাসের কোন চরিত্র অনুসরণ করা যাবেনা। এর কোন চরিত্র অনুসরণ করতে হলে অবশ্য অবশ্যই কোরআন হাদিসের কাছ থেকে সনদপত্র নিতে হবে। রাসুল (দঃ) এর সে হাদিসের কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে একজন নারী আর একজন পুরুষ এক জায়গায় হলে শয়তানকে দিয়ে ওখানে তিনজন হয়। আর শয়তান অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।

"গোলাপের কাঁটা" হৃদয়ে কাঁটার মতো বিধলেও চোখের পানি ঝরানোর কোন প্রয়োজন নেই। চোখের পানির অনেক দাম। চোখের পানি ঝরাতে হবে আল্লাহর কাছে। কাল্পনিক কোন কিছু পাঠ করে চোখের পানি ঝরায় তারাই যারা আবেগ প্রবন। যারা অর্থহীন কাজে বই পড়ে সময় নষ্ট করে, অনুগ্রহ করে বইটি তাদের হাতে তুলে দিন।

বইটি লেখার ব্যাপারে যে দু'জন আমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন, আমার লেখক জীবনের সার্বক্ষনিক সঙ্গী - প্রথমজন আমার জীবন সাথী মাকসুদা আক্তার মিতা ও অপরজন আমার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু এ এম আমিনুল ইসলাম। বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যারা অমূল্য অবদান রেখেছেন তারা হলেন বন্ধুবর আব্দুল আওয়াল, স্নেহাস্পদ মিজানুর রহমান স্বপন এবং ভাই সিরাজুল আলম তরফদার, আমি তাদের কল্যাণের জন্যে আল্লাহর দরবারে দোয়া করছি।

আব্দুস সালাম মিতুল

লেখকের অন্যান্য বই

- বোরখা পরা সেই মেয়েটি
- ঠিকানা পাইনি
- কুড়ানো মানিক
- হীরের শিকল
- পদ্মা এক্সপ্রেস
- কালো ওড়না
- নষ্ট ফুল
- ডুবন্ত পদ্ম
- পাপ মোচন
- রংধনু
- গোধূলী বেলায়
- নীল শাড়ী
- রক্ত প্রেম আগুন

এক

ভাবী-ও ভাবী? বলে ডাকতে ডাকতে আজাদ বাড়িতে প্রবেশ করে। আনন্দ উচ্ছ্বাস যেন তার চোখ মুখ দিয়ে উপচে পড়ছে। ভাবী-ভাবী গো-আবার ডাকে আজাদ।

কি হয়েছে ছোট চাচা? রুমী দক্ষিণ দিকের ঘর থেকে বের হয়ে আসতে আসতে আজাদের দিকে তাকিয়ে বলে। সে দৌড়ে গিয়ে পাঁচ বছরের রুমীকে কোলে নিয়ে গালে মুখে চুমো দিয়ে বলে-আমি স্টার পেয়েছি রে মানিক-আমি স্টার পেয়েছি। বলেই আবার রুমীর মুখে চুমো দেয়।

তোর মা কোথায় আম্মু আজাদ জিজ্ঞাসা করে রুমীকে।

পুকুর ঘাটে গেছে মা-কলমী শাক তুলতে। চাচা তুমি যে বললে স্টার পেয়েছো-আমাকে দেবেনা চাচা?

চাচা-ভাতিজা কি দেওয়া নেওয়া হচ্ছে। নাছিমা রান্না ঘরের দিকে যেতে যেতে আজাদ আর রুমীর দিকে তাকিয়ে বললো। তার আঁচলে পুকুর পাড় থেকে সদ্য তোলা কলমী শাক।

আজাদ কোল থেকে রুমীকে তাড়াতাড়ি নামিয়ে দিয়ে এক প্রকার দৌড়ে গিয়েই নাছিমার পায়ে হাত দিয়ে কদমবুছি করে।

কি হয়েছেরে আজাদ, এত কদমবুছি করছিস যে? বলতে বলতে সে ওর হাত ধরে তুলে এক হাত দিয়ে আঁচলের কলমী শাক ও অপর হাত দিয়ে গভীর স্নেহে আজাদকে জড়িয়ে ধরে।

আমি স্টার পেয়েছি ভাবী-আমি স্টার পেয়েছি।

আলহামদুলিল্লাহ-আল্লাহর লাখ শুকরিয়া যে তিনি আমার আজাদের দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন। তোর ভাইয়াকে বলেছিস?

ভাইয়াকে বলবো মানে-আমি স্কুল থেকে আসার আগেই আমার বন্ধুরা দোকানে এসে ভাইয়াকে ধরেছে মিষ্টি খাওয়ার জন্যে। ভাইয়া সবাইকে চা-বিস্কুট খাওয়ায়ে বলেছে সামনে হাটের দিন সবাইকে মিষ্টি খাওয়াবে। ভাইয়া খুব খুশী হয়েছে ভাবী। আমি যখন তার পায়ে কদমবুছি করার জন্যে হাত দিতে গেছি তখনই ভাইয়া আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করলো।

তুই ঘরে গিয়ে জামা কাপড় ছেড়ে রুমীকে নিয়ে পুকুর থেকে গোসল করে আয়। আমি তোদের জন্যে খাবার যোগাড় করি।

আজাদ জামা প্যান্ট খুলে লুঙ্গী পরে গামছাটা কাঁধে ফেলে এক হাত দিয়ে মাথায় তেল ঘষে ও অপর হাত দিয়ে রুমীকে ধরে পুকুর ঘাটে যায়।

চাচা-তুমি স্টার পেলে আর আব্বা সবাইকে স্টার খাওয়ায়ে দিল। আমাকে স্টার খাওয়াবে না চাচা?

রুমীর ছেলেমানুষী কথা শুনে আজাদ হো হো করে হেসে ওঠে। তারপর হাসি থামিয়ে ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলে-তোকে দোকানে নিয়ে যেয়ে ঈদ খাওয়াবো মানিক।

আজাদের আশ্বাসে রুমী খুশী হয়ে বলে-চাচা, মাছ ধরবে-বড়শী নিয়ে আসি?

না-রে মানিক, এখন না। ভাইয়া খেতে আসবে। তাড়াতাড়ি গোসল করে চল রান্না ঘরে যাই। মাছ পরে ধরবো।

দুই

আসাদ চৌধুরীর ইন্তেকালের পর সংসারের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব এসে পড়ে শফিকের ঘাড়ে। এক কালে নাটোর জেলার শেখ পাড়া গ্রামে আসাদ চৌধুরীই ছিলেন সেরা ধনী। একশত বিঘার উপরে ধানি জমি, বড় বড় কয়েকটি আম-কাঁঠালের বাগান, পুকুর ভর্তি মাছ, গোয়াল ভরা গরু, দুধের গরুই ছিল পনেরটি। গ্রামের গরিব-দুঃখীর শেষ ভরসা ছিল চৌধুরী বাড়ি। সংসারে খানেওয়ালা দশ জন। আসাদ চৌধুরীর দু' ছেলে-চৌধুরী আজাদ নোমানী আর চৌধুরী শফিক নোমানী, বাড়ির গিন্নী আর ঐ শফিক নোমানীর বউ, মেয়ে-পুরুষ নিয়ে কাজের লোক পাঁচজন। আজাদ তখন মাত্র দুধের বাচ্চা। চৌধুরী পরিবারে শফিক জন্ম নেওয়ার আঠারো বছরের মাথায় ঐ আজাদ জন্ম নেয়। তাও কত ডাক্তার কবিরাজ দেখিয়ে আল্লাহর দরবারে মানত মেনে।

গ্রামের কেউ চিকিৎসা করতে না পেরে রোগে কষ্ট পাচ্ছে-কারো মেয়ে যুবতী হয়ে উঠেছে-পয়সার অভাবে বিয়ে দিতে পারছে না -কারো ছেলের স্কুল-কলেজের বই কিনতে পারছে না-সবারই যেন ভরসা ঐ চৌধুরী গিন্নী। তার কানে গ্রামের কারো কোন অভাব অভিযোগ গেলেই হয়-অমনি তিনি স্বামীকে ডেকে বলবেন-আহা পয়সার অভাবে ঐ মন্ডলের মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না। সেয়ানা মেয়ে ঘরে রেখে বেচারী মন্ডল আর ওর বউ-এর চোখে ঘুম নেই। তুমি ওদের একটা ব্যবস্থা করে দাও গো। আল্লাহ তো আমাদের অনেকই দিয়েছেন। অভাবীকে সাহায্য করলে আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করবে।

বাড়ির কাজের বেটি আমেনার মা এসে বললো-মা, জাফর মুন্সীর ছয় মাসের বাচ্চাটা শুকায়ে কাঠ হয়ে গেছে। কি করবে গরিব মানুষ। দিন আনে দিন খায়, তার উপরে আবার বাচ্চার দুধ কিনবে কোথেকে? চৌধুরী গিন্নী অমনি আমেনার মাকে দিয়ে জাফর মুন্সীর বউ-এর কাছে খবর পাঠালো এখন থেকে যেন প্রতিদিন বাচ্চার দুধ নিয়ে যায়।

সেই দানবীর আসাদ চৌধুরীর সমস্ত ধন-দৌলত যে একদিন কালবৈশাখির উদরে প্রবেশ করবে, তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। চৌধুরী গিন্নী হঠাৎ জ্বরে পড়লেন। এই জ্বর আর ছাড়লো না। এলাকার ডাক্তারেরা যখন কোন রোগই ধরতে পারলো না তখন চৌধুরী গিন্নিকে ঢাকা পিজিতে ভর্তি করা হলো। এখানেও দীর্ঘ দিন চিকিৎসা করার পরে ধরা পড়লো কাল-ব্যাধি ক্যান্সার। ততদিনে আসাদ চৌধুরীর নগদ টাকা, সোনাদানা, ঔষধ, হসপিটাল আর

ডাক্তারের পিছনে শেষ। আসাদ চৌধুরী স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। পিজির ডাক্তারেরা যখন বললো-আর কেন, অনেকই তো করলেন, এবার বাড়ি নিয়ে যান। যে কদিন টিকে, বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যেই থাক।

ডাক্তারদের শেষ জবাব শুনে চৌধুরী যেন উন্মাদ হয়ে উঠলেন। তিনি যেন স্থির প্রতিজ্ঞা করে বসলেন-ক্যান্সারের উপরে বিজয়ী তাকে হতেই হবে। জমি বিক্রি করে কয়েক লক্ষ টাকা নিয়ে চৌধুরী গিন্নীকে আমেরিকায় নেওয়া হলো। কিন্তু সেখান থেকে কয়েক মাস পরে চৌধুরী বাড়িতে চৌধুরী গিন্নির লাশ কফিনে চড়ে এলো। স্ত্রীর বিয়োগ ব্যথা আসাদ চৌধুরীকে বেশি দিন সহ্য করতে হলো না। মাত্র ছয় মাস পরেই তিনিও একদিন শেষ বিকেলে তিন বছরের আজাদকে বৌমা নাছিমার কোলে দিয়ে বিদায় নিলেন।

তখন চৌধুরী বাড়ির জৌলুস আর নেই। থাকার মধ্যে বাড়িটা, পুকুর আর বিঘা দুয়েক জমি। শফিক নাটোর সুগার মিলে মাত্র পনের শত টাকা বেতনের চাকরি করে। আর জমিতে যা হয় তাই দিয়ে কোন রকমে চলে যায়। তার স্ত্রীরও রোগের কারণে বিয়ের পনের বছর পরে বাচ্চা হয়। এ জন্যে শফিকের স্ত্রী নাছিমা ঐ তিন বছরের আজাদকে সন্তান জ্ঞানেই মানুষ করে। ছেলে রুমী আর দেবর আজাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই নাছিমার চোখে।

তিন

শফিক কলেজে থাকতেই একটি ইসলামী সংগঠনের দাওয়াতে সংগঠনে যোগ দেয়। কলেজের লেখাপড়ার পাশাপাশি ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়ন করে সে বুঝতে পারে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সহযোগিতা না করলে পরকালে মুক্তির কোন আশাই নেই। তখন থেকেই সে পুরোপুরিভাবে ইসলামী আন্দোলন করে। গ্রামেও সে তার নিজের এলাকার অনেক মানুষকে ইসলামী আন্দোলনে সংগঠিত করেছে। পিতা-মাতা ইন্তেকালের পরও অভাবের তাড়নায় যখন সে চাকরি নিলো তখনো শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে সংগঠনের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলো।

একদিন শ্রমিকদের এক সমাবেশে ইসলামী শ্রমনীতি সম্পর্কে সে বক্তৃতা করার সময় ইসলাম বিরোধী সন্ত্রাসীদের বোমার আঘাতে তার বাম পা টা উড়ে যায়। তারপরও শফিকের উদ্যমে কোন ভাটা পড়েনি। সে বলে-কতজন তো আল্লাহর রাস্তায় জীবন কোরবানী করে শহীদ হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করেছে। আর আমি তো আল্লাহর রাস্তায় কাজ করতে গিয়ে মাত্র একটা পা হারিয়েছি।

আহত অবস্থায় হসপিটালে ভর্তি হবার পরে শফিকের স্ত্রী যখন তার শয্যা পাশে কাঁদছিল, তখন সে বলেছিল-আল্লাহর সৈনিকের স্ত্রীর চোখে পানি! বড়ই লজ্জার কথা। তোমার আরো গর্ব হওয়া উচিৎ যে, তোমার স্বামী আল্লাহর রাস্তায় একটি পা দান করেছে।

পঙ্গু হয়ে যাবার পরে শফিকের পক্ষে প্রতিদিন কয়েক মাইল দূরে এসে অফিস করা সম্ভব হয় না। ফলে বাধ্য হয়ে সে চাকরি ছেড়ে দেয়। সামান্য কিছু জমা টাকা ছিল তাই দিয়ে এবং সংগঠনের ভাইদের সাহায্যে শেখপাড়া হাটের পাশে শফিক একটি মুদিখানার দোকান দেয়। বাড়তি আয়ের জন্যে চাল-ডালের পাশাপাশি চা-বিস্কুটও বেচে। ছোট একটি ছেলেও রেখেছে সে তাকে সাহায্য করে।

ছোট ভাই আজাদকে শফিক ছোট থেকেই নিজ আদর্শেই গড়ে। ওকে কেন্দ্র করে তার অনেক আশা-ভরসা। ছোট ভাইয়ের পরীক্ষায় ফলাফল শুনে প্রথমে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। তারপর যখনই মনে হয়-তার পক্ষে তো শহরে রেখে আজাদকে লেখাপড়া করানো সম্ভব না। অত খরচ সে যোগাবে কোথা থেকে? এমনিতেই সংসার চলে না-তার উপরে আবার ছোট ভাইয়ের কলেজের খরচ! এ-যে কল্পনারও অতীত। অবশ্য দ্বীনি ভাইদের মধ্যে অনেকেই সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসে আজাদের রেজাল্ট শুনে। কিন্তু শফিক অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে সে সাহায্যের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়।

এমনিতেই অন্যের সাহায্যে সে দোকান করেছে-এই মর্মবেদনাতেই শফিক দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টা কষ্ট পাচ্ছে। নিজেকে অত্যন্ত ছোট মনে হচ্ছে। তার উপরে আবার আজাদের লেখাপড়ার জন্যে অপরের সাহায্য গ্রহণ? অসম্ভব। সে কারো সাহায্য নিয়ে তার আদরের ভাইকে লেখাপড়া করাবে না। প্রয়োজনে শেষ সম্বল জমি দু' বিঘা আর পুকুরটা বিক্রি করে দেবে সে। তবুও আজাদকে শহরে রেখে পড়াবেই। নানা চিন্তা করতে করতে শফিক দোকান বন্ধ করে ক্লান্ত তনু নিয়ে দুপুরে খাবার জন্যে বাড়ির পথে পা বাড়ায়।

নাহিমা ডাল আর কলমি শাক রান্না করতে চেয়েছিল। আজাদ টের পেয়েছে। ছেলেটার মুখে অনেক দিন ভালো মন্দ কিছু সে দিতে পারেনি। কয়েকটি ডিম রেখেছিল মুরগীর বাচ্চা ফুটানোর জন্যে। আজ সে ডাল আর কলমি শাক রান্না করার পর ডিম রান্না করতে বসে। শফিক বাড়িতে এসেই স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে -

আজ কি রান্না করছো নাহিমা? আজাদকে কি দিয়ে ভাত দিবে?

বাচ্চা ফুটানোর জন্যে ডিম রেখেছিলাম-ঐ ডিম রান্না করছি। পুকুরের ঘাটে বালতিতে পানি তুলে রেখেছি। তুমি গোসল করে নামাজ আদায় করো, তারপর খেতে দিচ্ছি।

খেতে বসে শফিক আজাদকে বলে-কোথায় ভর্তি হবি সে সম্পর্কে তুই কোন চিন্তা করেছিস নাকি?

ও কি চিন্তা করবে। কোথায় কোন কলেজ ভালো না খারাপ, তুমিই তো ভালো জানো। তবে আমার ইচ্ছা ওকে বড় কোন কলেজে ভর্তি করা-নাহিমা কথাগুলো বলতে বলতে আজাদের প্লেটে আরো একটা ডিম তুলে দেয়। আজাদ ডিমটা ভেঙ্গে অর্ধেকের বেশি রুমীর মুখে তুলে দেয়।

আমি ওকে জিজ্ঞাসা করছি কেন জানো? ওর এক বন্ধু আমাকে বলছিল, আজাদ নাকি ওকে বলেছে-আমি নাটোর কলেজেই ভর্তি হবো।

ও কেন বলেছে তুমি বুঝতে পারনি নাকি? শহরে বড় কোন কলেজে ভর্তি হতে চাইলে তুমি খরচ পত্র দিতে পারবে না। তা হবে না। তোমাকে আমি অনেক কষ্ট করে এত বড় করেছি। দরকার হয় জমি দু' বিঘা আর পুকুর বিক্রি করে হলেও তোমাকে ভালো কলেজে পড়তে হবে।

না-ভাবী না। ঐ সামান্য জমি বিক্রয় করে দিলে আমার রুমীর দাঁড়ানোর জায়গা থাকবে না। আমি নাটোর কলেজেই ভর্তি হবো-আজাদ যেন আর্তনাদ করে উঠে।

শফিক এতক্ষন নীরবে ভাত খাচ্ছিল। আজাদের কথার উত্তরে এবার সে বলে ওঠে-তোর ভাবী ঠিকই বলেছে। তোকে ঢাকা বা রাজশাহীতে যে কোন ভালো কলেজে ভর্তি হতে হবে। এর জন্যে যা কিছু বিক্রি করা দরকার আমি করবো। তুই লেখাপড়া শিখে যখন ভালো চাকরি করবি, তখন আবার জমি কেনা যাবে।

বড় ভায়ের মুখে ঢাকার নাম শুনতেই আজাদের মনে পড়ে গেল চৌধুরী চাচার কথা। ওর আব্বার সহযোগিতায় ও অর্থে চৌধুরী চাচা আজ কোটিপতি। ঢাকার প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি। বড় ভাই শফিকের মুখেই সে চৌধুরী চাচা সম্পর্কে তার অতীত-বর্তমানের সব কাহিনী শুনেছে। কোন দিন তাকে চাক্ষুষ দেখেনি। সে খাওয়া শেষ করে উঠে গামছায় হাত মুছতে মুছতে বলে-আচ্ছা ভাইয়া, শুনেছি চৌধুরী চাচা নাকি আব্বার সাহায্য সহযোগিতায় আজ কোটিপতি। একবার তার কাছে গেলে হয় না?

কোন চৌধুরী চাচা? শফিক জিজ্ঞাসা করে।

আজকাল তুমি সবই ভুলে যাও ভাইয়া? ঐ যে আমাদের মঈন চৌধুরী চাচা। যার কথা তুমিই তো আমাকে বলতে। সে নাকি মস্ত বড় ধনী। ঢাকায় থাকে।

ও---ঐ মঈন চাচার কথা বলছিস। ওনার কাছে গিয়ে কি হবে? শফিক সাগ্রহে জানতে চায়।

তিনি যদি ঢাকায় আমার ভর্তির ব্যবস্থা আর কিছুদিনের জন্যে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতেন, তাহলে আমি টিউশনি বা পার্ট টাইম কোন কাজ করে নিজেই চলতে পারতাম।

না-রে। ওনারা ধনী মানুষ। আমাদের মত গরীবদের কথা কি আর তিনি মনে রেখেছেন।

তবুও একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি ভাইয়া?

তাই বলে তুই অন্যের দয়ায় লেখাপড়া শিখবি? অন্যের কাছে ছোট হবি? একটু উত্তেজিত ভাবেই কথাগুলো বলে আজাদের ভাবী।

না, ভাবী। এর মধ্যে ছোট হওয়ার কি আছে। এক সময় তিনিও তো আমাদের সহযোগিতা গ্রহণ করেছেন। আর পরস্পরের সহযোগিতা গ্রহণ করেই তো মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বাস করে। আমি তো আর চিরদিন তাদের বাড়িতে থাকতে যাচ্ছি না।

যদি তোকে না চিনে-থাকতে না দেয়? তাহলে এই অপমান আমি সহ্য করতে পারবো না আজাদ। তোকে অপমান করার অর্থ হবে আমার মরহুম শ্বশুরকে অপমান করা। কারো কাছে সাহায্যের জন্যে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। বিঘা দুই জমি-পুকুর আমার হাতের দু' খানি বালা এখনো আছে। এগুলো দিয়েই তোর মাষ্টার ডিগ্রী পর্যন্ত খরচ চলবে।

না-ভাবী, না। আল্লাহ আমাকে অপমান করবেন না। তুমি আর ভাইয়া আমার জন্যে দোয়া করো। আমি যেন চাচার কাছে গিয়ে বিমুখ না হই।

শফিক এতক্ষন স্ত্রী ও ছোট ভায়ের কথা শুনছিল আর ভাত খাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি সে খাওয়া শেষ করে স্ত্রী নাছিমাকে পান দিতে বলে আজাদকে লক্ষ্য করে বললো-ঠিক আছে। তুই যখন এত করে বলছিস। তাহলে একবার গিয়ে দেখ-কি হয়। অনিচ্ছা সত্বেও শফিক নিরস কণ্ঠে অনুমতি দেয়। স্বামীকে অনুমতি দিতে শুনে নাছিমার চোখ দু'টি সজল হয়ে উঠে। ভাবীর চোখে পানি দেখে আজাদ ব্যাকুল হয়ে বলে-ভাবী, আমি জানি, তুমি আমার জন্যে কষ্ট পাবে-কিন্তু--

না-না, আমি কষ্ট পাবো না। আমি তোকে কাছে রাখলে তো তুই লেখাপড়া শিখতে পারবি না। তোর ভাইয়া যখন মত দিয়েছে আমারও কোন আপত্তি নেই। কিন্তু রুমীটা যে একা হয়ে যাবে। নাছিমা আঁচলে চোখ মুছতে থাকে।

খাওয়া শেষ করেই রুমী মাছ ধরার বড়শী রান্না ঘর থেকে নিয়ে পুকুর পাড় রেখে আসে। এই ভর দুপুরে বড়শী হাতে দেখলে মা বকবে। তাই মায়ের চোখের আড়ালে সে পুকুর ঘাটে বড়শী রেখে আজাদের কাছে এসে দাঁড়ায়, নাছিমা ও শফিক আজাদের পাশ থেকে সরে যেতেই রুমী ওর হাত ধরে বলে-চাচা চলো।

কোথায় রে মানিক?

ও বাবা-তোমার মনে নেই। মাছ ধরবে বলেছিলে যে?

এত রোদে পুকুর ঘাটে দেখলে ভাবী পিঠে চ্যালাকাঠ ভাঙবে। এখন চলো ঘুমাই। বিকালে মাছ ধরা যাবে। আজাদের কথা শুনে রুমী মুখ গোমরা করে তার সাথে ঘুমাতে যায়।

চার

পীচ ঢালা কালো মসৃণ পথ বেয়ে আর পি পরিবহনের চেয়ার কোচটি তীব্র গতিতে ঢাকার দিকে এগিয়ে চলেছে। রাস্তার দু' পাশে সারি সারি গাছগুলো চোখের পলকে পিছনে চলে যাচ্ছে। বাসের জানালা দিয়ে সবুজ শ্যামল বৃক্ষরাজি যেন ঐ দূর আকাশের শেষ সীমানায় মিশে গেছে। সেই দৃশ্যের দিকে আজাদ এক দৃষ্টে চেয়ে আছে। তার বেদনা বিধূর বিরহ-কাতর আর্দ্রবাদী মন নৈসর্গীক দৃশ্যে ভাই-ভাবী আর নয়নের মনি রুমীর বিদায় বেলার অশ্রু সজল নয়নগুলোর নীরব করুণ আর্তির মিলন খুঁজে পাচ্ছে। দিবাবসানে গোধূলী লগ্নের আগমন যেমন বিরহের বার্তা বয়ে আনে-পৃথিবীর উষ্ণ আলিঙ্গন থেকে সূর্যের বিদায়ক্ষণ এগিয়ে আসে সে গোধূলী লগ্নেই।

আজাদের জীবনের এই প্রথম অজপাড়া গাঁ-শেখপাড়া থেকে ঢাকার পথে পা বাড়ানো। যদিও সে সকাল আটটায় বাসে উঠেছে। কিন্তু সে সময়টি তার কাছে গোধূলী লগ্ন বলেই মনে হয়েছে।

জানালার কাছে বসে বাইরে তাকিয়ে প্রকৃতির দৃশ্য দেখছিল। নগরবাড়ী ঘাটের কাছাকাছি বাস আসতেই অন্য একটা বাসকে সাইড দিতে গিয়ে হঠাৎ ব্রেক চাপার ঝাকুনিতে আজাদ চমকে উঠে। তার চিন্তার জাল ছিন্ন হয়ে যায়। সামনে নদী। কি বিরাট নদী। কত বড় বড় জাহাজ নদীতে ভাসছে। রুমীটা যদি কাছে থাকতো-তাহলে কতইনা আনন্দ হতো।

আসার সময় ছেলেটা তার প্যান্ট হাত দিয়ে ধরে রেখেছিল। বার বার বলেছে-চাচা আমি যাবো। আমাকে নিয়ে যাবেনা চাচা? ভাইয়া মাত্র দু'শ টাকা দিতে পেরেছে। ভাবী লুকিয়ে দিয়েছে পঞ্চাশ টাকা। বাসের টিকেট কিনতেই আশি টাকা খরচ হয়ে গেল। ভাবী তার একটা ট্রাঙ্কেসে ভাইয়ার পুরানো প্যান্ট কেটে বানানো দু'টো প্যান্টের একটি ভরে দিয়েছে। আর একটি সে পরে এসেছে। একটি পুরানো শার্ট, একটি গামছা, চিরুণী আর খান কয়েক রুটি-ডিম ভাজি দিয়ে দিয়েছে। পথে ক্ষুধা পেলে যেন খায়। আজাদের নিজের লেখা কয়েকটি ছোট গল্পের পাণ্ডুলিপিও সে সঙ্গে এনেছে। ঢাকায় তো অনেক পত্রিকা প্রকাশ হয়-যদি পত্রিকায় গল্প ছাপা যায়।

চৌধুরী চাচার বাড়ির ঠিকানা শফিক একটা কাগজে লেখে আজাদকে দিয়ে মুখেও বুঝিয়ে দেয়, কিভাবে যেতে হবে। গুলশান দুই-এ চাচার বাড়ি। গাবতলী থেকে নাকি অনেক দূরে। ভাইয়া বলেছে বেবী টেক্সী ভাড়া করে যেতে। দুর ছাই-খামাখা কে পয়সা নষ্ট করবে। তার চেয়ে সে মানুষকে জিজ্ঞাসা করতে করতেই গুলশানে চাচার বাড়ি পৌঁছে যাবে। একটি টাকার অভাবে সে রুমীকে আইসক্রীম কিনে দিতে না পেরে বলেছে- আইসক্রীম খেলে ঠান্ডা লেগে জ্বর হতে পারে আব্বু।

গাড়ি এসে গাবতলীতে থামলো। আজাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। সে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে। শুধু বাস আর বাস। এত বড় বাস ইহাত সে জীবনে চোখে দেখেনি। কত মানুষ। সবাই যার যার ধান্ধায় ব্যস্ত। এত মানুষ। কাকে সে জিজ্ঞাসা করবে—গুলশান কোথায়? ভাইয়ার মুখে শুনেছে সে, ঢাকায় যারা নতুন আসে ঠগবাজেরা সুযোগ বুঝে সর্বস্ব হাতিয়ে নেয়। দরকার নেই—সে হেঁটেই যাবে। ড্রাইভার তাকে গুলশান গোল চক্করে নামিয়ে দেয়। বিশাল বিশাল অট্টালিকা দেখে আজাদ যেন ভিমড়ী খেয়ে পড়ে। এ সমস্ত বাড়ি তৈরি করতে কত টাকা লেগেছে? দশ লাখ—বিশ লাখ? না—তারও বেশি। বাবগো—ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার হিসেবে তার লাভ নেই।

বড় পাকা রাস্তার পাশে বিরাট মার্কেট। কত মানুষ গাড়ি নিয়ে এসে মার্কেট করছে। সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে এক দোকানদারের দিকে তার ভাইয়ার লিখা ঠিকানা সম্বলিত কাগজটা এগিয়ে দেয়। দোকানদার ঠিকানা লিখা কাগজের দিকে একবার চায় আবার সন্দিগ্ধ চোখে আজাদের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে। ভাবটা যেন এত কম দামী পোষাক পরা এক গ্রাম্য ছোকড়া মঈন চৌধুরীর মত ধনাঢ্য শিল্পপতির বাড়ি খুঁজছে কেন?

বলতে পারবেন ভাই বাড়িটা কোন দিকে? আজাদ জিজ্ঞাসা করে।

এই রাস্তা ধরে সোজা যেয়ে ডান পাশে বড় মসজিদ। মসজিদের পিছনেই তিন তলা বাড়িটাই মঈন চৌধুরীর। দোকানদার আজাদকে বলে দেয়।

বা-বা, তিন তলা বাড়ি করেছে চৌধুরী চাচা! মনে মনে আজাদ বলে।

অনেকখানি রাস্তা। অপরাহ্ন বেলা। সে হাঁটতে হাঁটতে এসে মসজিদের কাছে থামে। ওজু করে আসরের নামাজ আদায় করার জন্যে আজাদ মসজিদে প্রবেশ করে। কি সুন্দর বিশাল মসজিদ। মেঝের দিকে তাকালে চেহারা দেখা যায়। ভিতরে কত লাইট-ফ্যান। আর আমাদের গ্রামের মসজিদ। উপরে টিন, মাটির দেয়াল, তা-ও এক দিকে ভাঙা। শিয়াল-কুকুর মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করে। তার আব্বা মসজিদটি তৈরি করেছিলেন। আব্বার মৃত্যুর পর এ যাবৎ মসজিদে হাত পড়েনি। ভাইয়া সুস্থ থাকলে এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে ঘুরে ধান-চাল আদায় করে তা বিক্রি করে মসজিদ মেরামত করতো। কিন্তু ভাইয়া যে এক পা দিয়ে সব জায়গায় যেতে পারে না।

আজাদ নামাজ আদায় করে নিজের পোষাকের দিকে তাকায়। সারা দিনের জার্নিতে চেহারা যা হয়েছে, চেনাই যায় না। কিন্তু কিছুই করার নেই। ভালো জামা কাপড় কিনে দিবে—ভাইয়া এত টাকা কোথায় পাবে? গায়ের শার্ট-প্যান্ট সব কুঁচকে আছে। হাত দিয়ে টেনে সে সোজা করার চেষ্টা করে। ওজু খানায় গিয়ে পানি দিয়ে চুলগুলো একটু ভিজিয়ে আঁচড়িয়ে নেয়। যা হয় হবে। আজাদ চাবি দেওয়া পুতুলের মতো চলতে লাগলো, যেন দারোয়ান গলা ধাক্কা দিলেও সে অপমানবোধ করবে না, বিনা বাক্য ব্যয়ে-নিঃশব্দে সে বাড়িতে ফিরে যাবে। ঐ তো সামনের বাড়িটিই। আজাদ নিজের মনেই প্রশ্ন করে। নেম প্লেটে তো লেখা আছে এম চৌধুরী। মানে মঈন চৌধুরী। গেটে তিনজন দারোয়ান। তারপর

ফুলের বাগান। কত নাম না জানা রকমারী ফুল ফুটে আছে। তার ওপারেই তিন তলা বাড়ি, যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা এক জীবন্ত ছবি। বাড়ির পশ্চিম পাশে খেলা মাঠের মত। সেখানে অনেকগুলো ছেলে মেয়ে এক সাথে বসে আড্ডা দিচ্ছে। এ কি-রে বাবা, মেয়েগুলোর লজ্জা শরমের বালাই নেই। ছেলেদের সাথে দাঁত বের করে কেমন হিঃ হিঃ করে হাসছে! চুলোয় যাক ওরা। বাড়িতে ঢুকবো না ঢুকবো না। দারোয়ানরা যদি যেতে না দেয়। না সে নামাজ আদায় করে দোয়া করেছে—আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করবেন না।

আজাদ সটান গেটের মধ্যে ঢুকে পড়ে। না—কেউ কিছু বললো না। এভাবে দিনে অনেক লোকই বোধ হয় আসা যাওয়া করে। বাগান পার হয়ে সে বাড়ির সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। সামনে বিরাট হল রুম। ছয়-সাতজন মানুষ বসে আছে। একজন বুড়ো মানুষ সোফায় হেলান দিয়ে বসে সবার কথা শুনছেন। গায়ে পাতলা গেঞ্জী। মুখে সাদা দাড়ি। মাথায় টুপী। কপালের মধ্যখানে কালো দাগ। নামাজীর চিহ্ন। ইনিই বোধ হয় চৌধুরী চাচা। ইনি নামাজী মানুষ আর তার বাড়ির ঐ পাশে ছেলে মেয়ে এক সাথে আড্ডা দিচ্ছে! আশ্চর্য। ইসলামকে এরা শুধু নামাজ-রোজা, হজ্ব-যাকাতের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই বন্দী মনে করে। একটা চাকর আজাদের দিকে তাচ্ছিল্যভাবে তাকিয়ে চলে গেল। একটা বিরাট বাঘের মতই কুকুর তার দিকে হিংস্রভাবে তাকিয়ে এগিয়ে আসছে। এ আপদটা আবার কোথা থেকে আসলো? হে আল্লাহ, তুমি আমাকে হেফাজত করো। কুকুরটি কাছে এসে আজাদের পায়ের হাঁটুর কাছে শুঁকে অন্য দিকে চলে গেল।

বৃদ্ধ উপস্থিত লোকদের কথা শুনতে শুনতে সামনের দিকে তাকাতেই আজাদের উপরে তার নজর পড়ে। তিনি মাথা উঁচু করে জানতে চান—কে? কি চাও বাবা?

জ্বি—আমি বলতে বলতে আজাদ তার ধূলো মলিন টায়ারের স্যান্ডেল পায়ে দিয়েই দামী কার্পেটের উপর দিয়ে বৃদ্ধের সামনে দাঁড়িয়ে ছালাম দিয়ে বলে—আমি শেখপাড়া থেকে এসেছি। আব্বার নাম আসাদ চৌধুরী।

কি—বলে বৃদ্ধ যেন বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট মানুষের মত ঝাকুনি খেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দু' হাত বাড়িয়ে দিয়ে আজাদকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমো দেন।

গভীর মমতায় বৃদ্ধ তার পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। সস্নেহে সোফায় নিজের গা ঘেসে আজাদকে বসিয়ে এক হাত ওর পিঠের উপর দিয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করেন—শফিক কেমন আছে?

ইসলামের শত্রুরা বোমা মেরে ভাইয়ার পা উড়িয়ে দিয়েছে। তিনি এখন পঙ্গু অবস্থায় বাড়িতেই থাকেন। আর ছোট একটা মুদি দোকান করেছেন।

ইসলামের শত্রুরা!

জ্বি—ভাইয়া ইসলামের অর্থনীতি ব্যাখ্যা করে এক শ্রমিক সমাবেশে বক্তৃতা করছিলেন। সেই অবস্থায় যারা বোমা মারলো—তারা ইসলামের শত্রু ছাড়া আর কি?

তা—বাড়িতে আর কে কে আছে বাবা?

ভাবী আর ছোট্ট রুমী–ভাইয়ার ছেলে পাঁচ বছরের।

উপস্থিত লোকেরা চৌধুরী ইন্ডাষ্ট্রীর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা। তারা এতক্ষণ এই উপদ্রবটাকে বিরক্তির চোখেই দেখছিল। ভেবেছিল কোন সাহায্যের আশায় হয়ত এসেছে। এখন বুঝলো ছেলেটি চৌধুরী সাহেবের বিশেষ আপনজন। তারা বললো–স্যার, আমরা তাহলে আজ উঠি। ঐ বিষয়টা আগামী কালের বোর্ড অব ডিরেক্টরস্‌দের মিটিং–এ আলোচনা করা যাবে।

আচ্ছা, আজকে তাহলে আপনারা যান। এই কে আছিস এ দিকে আয়। চৌধুরী হাঁক দিলেন।

যে চাকরটা কিছুক্ষণ পূর্বে আজাদের দিকে তাচ্ছিল্যভাবে দেখে গিয়েছিল সে এসে সামনে দাঁড়ায়।

একে উপরে নিয়ে যা–তোর মাকে গিয়ে বল আসাদের ছেলে। ও–তোমার নাম জিজ্ঞাসা করতেই মনে নেই–

জ্বি–আজাদ নোমানী।

বাড়ির চাকরেরা চৌধুরী সাহেবকে আব্বা আর তার স্ত্রীকে মা বলেই সম্বোধন করে। চাকরটা এবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আজাদের দুমড়ানো–মুচড়ানো জামা প্যান্টের দিকে বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। সে তাকানো এমন অবজ্ঞাপূর্ণ যে আজাদের মনে হয় হাঁদারামটাকে কান ধরে বুঝিয়ে দেয় সে এ বাড়ির মালিকের বন্ধুর ছেলে। কিন্তু চৌধুরী চাচার স্নেহ কোমল দৃষ্টি ওর সারা শরীরে আপতিত রয়েছে মনে করে সে সান্ত্বনা খুঁজে পায়।

পাঁচ

মঈন চৌধুরীর গ্রামের বাড়িও ছিল আজাদদের গ্রামেই। আজাদের আব্বা আসাদ চৌধুরী ছিলেন মঈন চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে সময় মঈন চৌধুরীর আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। গ্রামের স্কুলে সামান্য বেতনে চাকরি করতেন। সংসারে তখন তিন ছেলে আর এক মেয়ে। পরে অবশ্য ঢাকায় আসার পরে আরো দুই মেয়ে ভূমিষ্ট হয়। গ্রামে সামান্য চার কাঠা জমির উপরে বাড়ি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আজাদের আব্বার সাহায্যেই অধিকাংশ সময় সংসার চলতো। ঈদ–পরবের সময় আসাদ চৌধুরী নিজ বাড়ি ও সন্তানদের জন্যে যা করতেন বন্ধু মঈনের ছেলে–মেয়ের জন্যেও তা–ই করতেন। হঠাৎ আসাদ চৌধুরীর কাছে মঈন চৌধুরী এসে বলে–আমি ঢাকায় সাপ্লাই এর একটা কাজ পেয়েছি, সামান্য কিছু টাকা হলে ব্যবসাটা ধরতে পারি।

তা–কত টাকা লাগবে মঈন? আসাদ চৌধুরী বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেই তার দিকে তাকিয়ে দেখে সে মাথা নীচু করে আছে। তিনি আবার বলেন–অত মাথা নিচু করে থাকার কি আছে। আমার একজন ভাই থাকলে তাকে কি আমার দিতে হতো না। তুমি তো আমার ভায়ের মতই।

না–সে কথা না। তোমার কাছে থেকে আর কত নেব। অনেকই তো তুমি করলে আমার জন্যে।

ও সব কথা থাক। এখন কত লাগবে তাই বলো।

হাজার বিশেক হলেই চলবে।

বিশ হাজার টাকা দিয়ে ঢাকার মত জায়গায় তুমি কি ব্যবসা করবে মঈন? তার চেয়ে পঞ্চাশ হাজার দিয়ে শুরু করো। আসাদ মঈনকে চেক দিয়ে দেয়।

ঐ পঞ্চাশ হাজার আজ আল্লাহর রহমতে পঞ্চাশ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। প্রায় বছর খানেক পরেই মঈন তার বন্ধুকে সমস্ত টাকা পরিশোধ করে দেয়। মঈন চৌধুরী তার অতীত জীবনের দারিদ্রতায় জর্জরিত নির্মম দিনগুলোর কথা ভুলে যান নি।

তিনি একটু একটু করে আজাদের কাছ থেকে ওদের সংসারের সমস্ত কথা শুনে ব্যথায় যেন মূহ্যমান হয়ে পড়েন। তিনি আপন মনেই বলতে থাকেন–আসলে আমিই দায়ী। আমি এতদিন তোমাদের কোন খোঁজ খবর নেই নি। তোমার ভাই–ও আমার কাছে একটি বার আসেনি। আসাদের ছেলে তো, অনাহারে মরে গেলেও কারো কাছে হাত বাড়াবে না, তা আমি জানি। কি করবে বাবা–সবই নছিব। বৃদ্ধের গলা যেন ধরে আসে। আজাদ মঈন চাচার দিকে তাকিয়ে দেখে তার চোখে যেন সব হারানোর এক করুণ হাহাকার ফুটে উঠেছে। মেয়েলী কণ্ঠের ডাকে হঠাৎ চমকে উঠে আজাদ। সামনে দৃষ্টি দিতেই দেখে তার

থেকে সামান্য ব্যবধানে অপূর্ব সুন্দরী লম্বা এক ষোড়শী-তন্বী-তরুণী দাঁড়িয়ে চৌধুরী চাচাকে বলছে-ছেলেটি কে আব্বু?

সে এত সুন্দরী মেয়ে জীবনে দেখেনি। শ্যাম্পু করা দীর্ঘ কালো চুল পিঠের উপরে ছড়িয়ে আছে। মেঘ মুক্ত স্বচ্ছ আকাশের মাঝখানে যেন কালো মেঘ। হাল্কা নীল রং-এর সালোয়ার কামিজ পরনে। শরীরের সমস্ত অলংকারাদি পোষাকের সাথে সামাঞ্জস্য রেখে পরেছে সালমা। হাতে গিটার। গান শিখতে গিয়েছিল। হল রুমে প্রবেশ করে বাপের কোল ঘেষে এক যুবককে বসে থাকতে দেখেই সে ধরে নিয়েছে-যুবকটি আব্বার বিশেষ স্নেহের পাত্র।

আজাদ স্থান কাল পাত্র ভুলে যেন সালমার দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর শরীরের কড়া সেন্টের গন্ধ এসে তার নাকে ঝাপটা দেয়। হঠাৎ তার মনে পড়ে ইসলামের নির্দেশ-একবার বা দু' বারের বেশি কোন মেয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাবে না। আর সে এভাবে হ্যাংলার মত তাকিয়ে আছে-আল্লাহ মাফ করো। সে তার দৃষ্টি অবনত করে।

মেয়ের ডাকে বৃদ্ধ যেন সম্বিত ফিরে পায়। ও, মা সালমা। এ তোর আসাদ চাচার ছোট ছেলে আজাদ। এইমাত্র গ্রাম থেকে এলো।

সালমা তখন তাকিয়ে দেখছে আজাদের পায়ে মোটরের টায়ারের ধূলি-মলিন স্যান্ডেল। পরনে দুমড়ানো-মুচড়ানো পুরোনো জামা-প্যান্ট। মাথায় অবিন্যস্ত চুল।

আসাদ চাচার ছেলে-মানে শফিক ভায়ের ছোট ভাই! সালমার কণ্ঠে বিস্ময়। তা-এখনো ওকে তুমি এই হল রুমে বসিয়ে রেখেছো। আজাদ ভাইয়া আসুন আমার সাথে।

যাও বাবা, তোমার চাচীর কাছে যাও। আর হ্যাঁ-মা, একটু লক্ষ্য রাখিস ওর দিকে। ও পাড়া গাঁয়ের ছেলে। কোনদিন ঢাকা আসেনি।

তুমি কিচ্ছু ভেবনা আব্বা। আমি এখুনি ঘষে মেজে ওকে মডার্ণ ইয়ং বয় বানিয়ে দিচ্ছি। বলেই সালমা দক্ষিণা বাতাসে দোল খাওয়া বেয়ে উঠা লতার মতই সামনে এগিয়ে যায়। আবার ঘাড় বাঁকিয়ে পিছনে দেখে আজাদ ব্রীফকেস হাতে তার পিছনে আসার জন্যে দাঁড়িয়েছে। সালমা বলে উঠে-ওটা রেখে আসুন। চাকরকে ডেকে বলে-ব্রীফকেসটা উপরে নিয়ে আসতে। আজাদ কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলে-তখন ছালাম দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। আসসালামু আলাইকুম।

ছালামের জবাব দিয়েই সালমা হাসিতে যেন ফেটে পড়ে। সে বলে-যেমন করে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, আমি তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম, তা ছালাম দিবেন কখন।

লজ্জায় আজাদ যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে। তার পা আর চলতে চায় না। ধীরে ধীরে সে সালমার পিছনে যেতে থাকে।

কি সুন্দর দামী মোজাইক করা মেঝে। আজাদের টায়ারের স্যান্ডেল পিছলে যাচ্ছে। দেয়ালে দেয়ালে বিভিন্ন ধরনের নয়নাভিরাম ছবি। লাল-নীল ঝাড়বাতি। বৈদ্যুতিক আলোয় যেন চোখ ঝলসে যায় আজাদের। একটা বাথ রুমের সামনে এসে হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে

দরোজা খুলে সালমা বলে-অনেক দূর থেকে এসেছেন। সারা দিন আপনার উপর দিয়ে বহু ধকল গেছে। আপনি গোসল করে নিন। শরীরটা ভালো লাগবে। সালমা ওকে লক্ষ্য করে বলে।

আমার সমস্ত কাপড় তো ঐ ব্রীফকেসে। গোসল করে তো ওগুলোই পরতে হবে। বাথ রুমের দিকে তাকিয়ে আজাদ বলে।

আচ্ছা আমি দেখছি-বলে সালমা চলে যায়। কিছুক্ষণ পরে সে দামী পা' জামা, পাঞ্জাবী, স্যান্ডেল, আন্ডার ওয়্যার, গেঞ্জী আর টাওয়াল নিয়ে ফিরে এসে আজাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে-গোসল করে এগুলো পরবেন।

আজাদ অবাক কণ্ঠে বলে-জ্বি, আমার জামা কাপড় কোথায়?

আজাদ ভাইয়া-ওগুলো এ বাড়িতে বেমানান। আপনাকে এগুলোই আপাততঃ পরতে হবে। তারপর মার্কেটে গিয়ে জামা-কাপড় কিনলেই হবে।

এ সমস্ত জামা-কাপড় কার?

অত খোঁজে আপনার প্রয়োজন কি? যা বলছি তাই করুন। আমি প্রতিদিন বিকেলে গানের স্কুল থেকে এসে নাস্তা করি। আজ আপনাকে নিয়ে নাস্তা করবো। নিন ঝটপট করুন। আমার ক্ষুধা পেয়েছে। ভিতর থেকে দরোজা বন্ধ করে দিয়ে গোসল করুন-আমি আসছি।

গোসল করবো পানি কোথায়? বাথরুমে প্রবেশ করতে করতে আজাদ বলে।

সালমা পুনরায় ফিরে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ আজাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে-এই যে, এই টা এইভাবে ঘুরালে পানি পড়বে আর এইভাবে ঘুরালে পানি বন্ধ হবে।

বাথরুমে প্রবেশ করে সে শাওয়ার ছাড়ার কৌশল আজাদকে দেখিয়ে দিয়ে বাইরে আসতেই তার শরীরে আলতোভাবে ওর ছোঁয়া লাগে। সে তাড়াতাড়ি বাথরুমের দরোজা বন্ধ করে দিয়ে কিছুক্ষণ হতভম্বের মতই দাঁড়িয়ে থাকে। সে এই উনিশ বছরের জীবনে কোনদিন তার মাতৃসম মমতাময়ী ভাবী ছাড়া আর কোন নারীর স্পর্শ পায়নি। আজ এক অসতর্ক মুহূর্তে সালমার লাবণ্যময়ী শরীরের স্পর্শে তার শরীরে কেমন যেন শিহরণ জাগে। সে ভাবে-এ বাড়ির মেয়েরা কি এমন লজ্জাহীনভাবে পর পুরুষদের সাথে চলাফিরা করে নাকি। না-সে তার আব্বার বন্ধুর ছেলে বলে তাকে দেখে কোন লজ্জা করছেনা। কি সাবলীল ভঙ্গী মেয়েটার। ওর মুখের কথা যেন বীণার তারে সুমিষ্ট ঝংকার তোলে। মন ছুটে চলে যায় যেন কোন অজানা গোপন প্রেমের আবেশময় ভাবের জগতে। কি সুন্দর মাথার চুলগুলো মেয়েটির। ভ্রমরের মতই সালমার এলায়িত কালো চুলের রাশি। কাজল কালো বাঁকা ভ্রু যুগলে মমতার উষ্ণ আলিঙ্গনের আহবান যেন। উজ্জ্বল ফর্সা মুখমন্ডলে চোখ দু'টি যেন শুভ্র সাগরে পরিস্ফুটিত রক্ত কমল। চোখে কি মায়াবী চাহনী। ওর অন্তরভেদী চাহনীতে হৃদয়ের সুপ্ত বীণা গুঞ্জরণ সৃষ্টি করে। রক্তিম আভাযুক্ত গন্ডদ্বয়ে প্রেমের আহ্বনার তৃষ্ণা। উন্নত সুগঠিত বক্ষে প্রেমের সঞ্জিবণী শুধা যেন যুগ যুগ ধরে গড়িয়ে পড়ার অপেক্ষায়।

দুত্তরি, এ সব সে কি ভাবছে? একটা অনাত্মীয় মেয়েকে নিয়ে এ ধরনের গর্হিত কল্পনা করা অন্যায়। মনের খবর আল্লাহ রাখেন। তার কাছে শেষ বিচারের দিনে মনের যাবতীয় কল্পনারও হিসেব দিতে হবে। সে এখানে এসেছে নিজেকে গড়ার জন্যে। ভাই-ভাবী আর আদরের রুমীকে একটু সুখ শান্তি দেওয়ার আশায়। সে তো এদের কাছে সাহায্যপ্রার্থী-হ্যাঁ, সাহায্য গ্রহণের জন্যেই তো। করুণা প্রার্থী হিসেবেই সে এসেছে। সে-কি সাহায্য পাবে এখানে? এই ধনগর্বী বিলাসী মানুষগুলো কি তার হৃদয়ের অব্যক্ত আর্তনাদ শুনতে পাবে? মনের গোপন কুঠুরীতে সে যে আশা-ভরসা নিয়ে এখানে এসেছে-তা কি এরা বাস্তবায়িত করার সুযোগ দিবে? না-হতাশ হবার কিছু নেই। আল্লাহ হতাশ হতে, মন ভাঙ্গা হতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন।

আজাদ শাওয়ার ছেড়ে গোসল সেরে সালমার দেওয়া পা' জামা-পাঞ্জাবী পরে মাথা আঁচড়ায়। বাথরুমের আয়নায় সে নিজেকে সুন্দর সুঠাম-বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরা এক যুবক হিসেবেই দেখতে পায়। এখন তাকে কে বলবে-সে গ্রামের ছেলে? উজ্জ্বল ফর্সা মুখমন্ডলের ডান পাশে কালো তিলটি আজাদের নিজের কাছেই সুন্দর লাগে। ও যখন ক্লাস সেভেনে তখন ওর ভাবী বলতো- তোর ঐ তিলটির দিকেই মেয়েরা চেয়ে থাকবে দেখিস।

লজ্জা পেয়ে আজাদ অন্যত্র সরে গিয়েছিল। আজ সে দেখে তার রক্তিম অধরের উপরে ঘন কালো সদ্য গজানো গোঁফ যেন অদম্য পৌরুষের ইঙ্গিত বয়ে আনছে। চিরুণী দিয়ে সে গোঁফ আঁচড়ায়। সে তো দেখতে বেশ সুন্দর! ইতিপূর্বে সে এত বড় আয়নায় নিজের ছবি দেখেনি। ওহ্-হো, কি যে ভুলো মন তার। সালমা তার জন্যে এখনো বিকালের নাস্তা করেনি। কথাটা মনে পড়তেই আজাদ তাড়াতাড়ি বাথরুমের দরোজা খুলে। সামনেই দেখে সালমা দাঁড়িয়ে আছে।

আজাদের ফর্সা মুখে তারুণ্যের দীপ্তি। সবেমাত্র গোসল করা চুল থেকে বিন্দু বিন্দু পানি গড়িয়ে কানের পাশ বেয়ে নেমে আসছে। সাদা পোষাকে আজাদকে যেন নীল আকাশে উড়ন্ত বলাকা বলে মনে হচ্ছে সালমার কাছে। সে একটু ব্যবধানে থেকেই আজাদের শরীরে দামী সেন্ট স্প্রে করছে আর অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। সেন্টের কড়া ঝাঁঝ আজাদের নাকে যেতেই বলে উঠে-এটা বোধ হয় খুব দামী আতর।

জ্বি-না। এটা আতর না। বড় আপা আমেরিকা থেকে আমার জন্যে এই সেন্টটা পাঠিয়েছে।

আপনার জিনিস আমাকে দিলেন যে?

আপনজনদের প্রিয় জিনিস-নিজের জিনিসই দিতে হয়। এখন চলুন আপনার জন্যে আম্মা নাস্তা নিয়ে বসে আছেন।

আজাদের মনে সালমার কথাগুলো কেমন যেন গুঞ্জরণ সৃষ্টি করে। এরা তাহলে ওকে আপনজন বলেই গ্রহণ করেছে। নইলে সালমা ওকে নিজের সেন্ট নিজ হাতে গায়ে মাখিয়ে

দিয়ে বলবে কেন-আপনজনকে নিজের জিনিসই দিতে হয়। যাক কিছুটা হলেও সে চিন্তামুক্ত হলো। এখন বাড়ির অন্যান্যরা তাকে কিভাবে গ্রহণ করবে কে জানে। আজাদ ধীর পায়ে সালমার পিছে পিছে যেতে থাকে আর ভাবতে থাকে। ওর থেকে দু' এক বছরের ছোটই হবে সালমা। লেখাপড়া কি করে পরে জানা যাবে। কিন্তু কি তীক্ষ্নধী তরুণী যার প্রতি কথায় যেন বিদ্যুতের চমক।

দোতালার পূর্ব দিকের রুমে প্রবেশ করেই সালমা বলে-আম্মা, এই হলো আজাদ ভাইয়া। আর এটা হলো আমাদের মানে আপনারও বড় ভাবী। আজাদ তাকিয়ে দেখে রুমের এক দিকে দামী মেহগনী খাটের উপরে সালমার আম্মা এবং তার বড় ভাবী বসে আছে। সে ছালাম দিয়ে কদমবুসীর জন্যে হাত বাড়াতেই সালমার আম্মা আজাদের হাত ধরে কাছে বসিয়ে বলেন- বেঁচে থাকো, বাবা বেঁচে থাকো।

সালমার বড় ভাবী শ্বাশুড়ীর দিকে পান এগিয়ে দিতে দিতে বললেন-একেবারে ছেলে মানুষ। আমি মনে করেছিলাম কতই না বড় হবে।

আজাদ ভাইয়ার বড় ভাইয়ার নাম শফিক নোমানী। আর এর পুরো নাম আজাদ নোমানী। মা তুমি তো জানো। সালমা কথা বলতে বলতে চাকু দিয়ে আপেল কাটতে থাকে।

হ্যাঁ মা, আমি জানি। খাও বাবা। অনেক দূর থেকে এসেছো। কখন সেই সকালে খেয়ে এসেছো। এখন খাও তারপর তোমাদের বাড়ির সবার কথা শুনবো। আর আজ থেকে তোমাকে আমি শুধু আজাদ বলেই ডাকবো। সালমার আম্মার কথা শেষ হতেই সালমাও বলে-আমিও কিন্তু আজাদ ভাইয়া বলেই ডাকবো।

আজাদ মাথা নীচু করে খেতে থাকে। সালমার আম্মা আবার বললেন-বাড়িতে সবাই এত কষ্ট করছো বাবা, আমাদেরকে অন্তত একটা পত্র দিয়েও সব কথা জানাতে পারতে।

আমাদের মনে ছিল আপনাদের কথা। কিন্তু ভাইয়া কেন যে এখানে আসেনি তিনিই জানেন।

আসল ব্যাপার কি জানো মা, ধনী যদি গরীব হয়ে যায় কখনো কিন্তু তাই বলে তার আভিজাত্যবোধ মুছে যায় না। বলেই সালমা যেন কোন দিকে চলে গেল। আজাদের মনে হলো আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত লাভা যেন তার পাশ দিয়ে গড়িয়ে গেছে কিন্তু তার স্নিগ্ধ উষ্ণতা যেন এখনো রয়েছে।

এখানে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই বাবা, তোমার আব্বার কাছে থেকে টাকা নিয়েই তোমার চাচা ব্যবসা করে এই ঢাকায় বাড়ি-গাড়ি করেছে। তোমার আব্বার দানেই আজ তোমার চাচা কোটিপতি। এটা তোমার নিজের বাড়িই মনে করবে বাবা।

শফিক ভাইয়া পঙ্গু মানুষ বলে না হয় আসতে পারেনি। কিন্তু আমার ভাইয়ারা তো একবার গিয়ে খোঁজ নিতে পারতো। খেলা দেখতে তারা দিল্লী-আমেরিকা যেতে পারেন, আর কয়েক ঘন্টার রাস্তা গাড়ি দিয়ে আসাদ চাচার ছেলেদের খবর নিতে তারা পারেন না।

আজ সবাই বাড়িতে এলে আমি বলবো, এ ধরনের অকৃতজ্ঞতা মঈন চৌধুরীর ছেলেদের জন্যে বড়ই লজ্জাকর। অকস্মাৎ সালমা এসে উত্তেজিত কণ্ঠে কথাগুলো বলে।

আচ্ছা আম, ঐ দিকের এটাচড বাথরুম যে ঘরে সেখানেই আজাদ ভাইয়ার থাকার ব্যবস্থা করলাম। খাওয়া হয়েছে আপনার-তাড়াতাড়ি করুন যেতে হবে। নীচে ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে বসে আছে।

লজ্জা জড়িত কণ্ঠে আজাদ জিজ্ঞেস করে-কোথায় যেতে হবে?

ভয় নেই। নিয়ে গিয়ে কোন নদীতে ফেলবোনা। যা বলছি চটপট শুনতে হয়। বলেই সে তার আম্মাকে বলে- পাঁচ হাজার টাকা দাও তো মা।

এত টাকা দিয়ে কি করবি মা? সালমার আম্মা মেয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে। সালমা তার আম্মার কানের কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে কি যেন বলার পরে তিনি আলমারীর চাবি মেয়ের দিকে এগিয়ে দেন।

গাড়ির পিছনের সিটে আজাদ আর সালমা পরস্পরে দূরত্ব বজায় রেখেই বসে। এ ধরনের গাড়িতে সে জীবনে ওঠেনি। মনে মনে সে আল্লাহর শুকরিয়া জানায়। সালমার দিকে তাকিয়ে বলে-আপা, মাগরিবের সময় হয়ে এলো। নামাজ আদায় করতে হবে।

ঠিক আছে। যে কোন মসজিদের পাশে আমি গাড়ি নিয়ে দাঁড়াবো। আপনি নামাজে যাবেন। আর আমাকে আপনি আপা বলে না ডেকে নাম ধরেই ডাকবেন। আর তুমি করে বলবেন। আমি এই বাড়ির সবার ছোট। সবাই আমাকে তুমি করেই বলে।

ওরা সবাই আপনার আপন-তাই তারা তুমি করে বলে। আমি তো আপনাদের অতিথি, আমি কি করে-

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সালমা ঝংকার দিয়ে বলে উঠে- কি বললেন-আপনি অতিথি? আপনি আমাদের আপন নন? তাহলে কেন এসেছেন। কোন সম্পর্কের দাবী নিয়ে এসেছেন। পর হলে পরই থাকতেন। আমরা যখন আপনার পর তাহলে না আসলেই পারতেন আজাদ ভাইয়া। কথাগুলো বলে গাড়ির জানালা দিয়ে সালমা উদাসভাবে বাইরে তাকিয়ে থাকে। উত্তেজনায় তার চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে।

দেখুন, আমি আসলে কথাগুলো ওভাবে বলতে চাইনি। আমি এই প্রথম আপনাকে দেখলাম। এখনই কিভাবে আপনাকে নাম ধরে ডাকবো-তুমি করে বলবো।

কেউ কারো আপন হলে প্রথম দেখাতেই হয়। এই বাড়িতে আপনার এত ছোট হবার কিছু নেই। এই বাড়ির মালিক আপনার আব্বার কাছে ঋণী। আপনি এখানে সবার স্নেহের পাত্র।

আপনি এ সব জানলেন কেমন করে?

আব্বার মুখেই শুনেছি। তিনি তার বন্ধু মানে আপনার আব্বার কথা সব সময় স্মরণ রেখেছেন। এবার থেকে আমি যা বলেছি সে ভাবেই আমার সাথে কথা বলবেন।

তাহলে আপনাকেও তুমি করে আমার সাথে বলতে হবে।

আচ্ছা তাই হবে। বলেই সালমা হেসে উঠে। সে হাসিতে আজাদও যোগ দেয়।

ইতিমধ্যে গাড়ি নিউ মার্কেটে আসতেই মাগরিবের আজান শোনা যায়। আজাদ দ্রুত গাড়ি থেকে নামতে নামতে সালমাকে বলে-আমি নামাজ আদায় করে আসি।

আজাদের জন্য সালমা নিজের পছন্দমত জামা জুতো প্যান্ট কিনে। সে অবশ্য প্রবল আপত্তি করেছিল, সালমা ওর কথায় কান দেয়নি। আজাদ বলেছিল-এত দামী জামা কাপড় তুমি না কিনলেও পারতে সালমা। কম দামের হলেই আমার চলতো।

তোমার চলতো, কিন্তু আমার চলতো না। কম দামী পোষাকের জন্যে তোমার দিকে কেউ বাঁকা চোখে চাইবে তা আমি সহ্য করতে পারবো না। সালমার কথায় কিসের যেন সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা।

আচ্ছা সালমা-তুমি কোথায় লেখাপড়া করছো?

আমি তো এবার এস এস সি পাশ করলাম। কলেজে ভর্তি হবো। তুমি-বলেই সে আজাদের মুখের দিকে স্বপ্রশ্ন তাকায়।

আমিও এবার এস এস সি পাশ করলাম।

কোন ডিভিশনে?

আগে তোমারটা বলো?

চার লেটার ফার্স্ট ডিভিশন-আর তোমার?

স্টার পেয়েছি।

কী! স্টার পেয়েছো-বলেই সালমা যেন আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। তা কোথায় ভর্তি হবে আজাদ ভাইয়া? শফিক ভাইয়াকে বলে তুমি যদি ঢাকায় ভর্তি হতে পারো সে জন্যে আমি আজই তার কাছে পত্র লিখবো।

কষ্ট করে তোমার আর পত্র লিখতে হবে না। ঢাকায় ভর্তি হওয়ার জন্যেই আব্বা আমাকে চাচার কাছে পাঠিয়েছে। এখন চাচা যদি দয়া করে।

আবার দয়ার কথা বলে নিজেকে ছোট করছো কেন আজাদ ভাইয়া। আগেই না বলেছি, আব্বা তোমাদের কাছে ঋণী। তা-এ সমস্ত কথা তুমি আব্বাকে বলেছো?

বলার আর সুযোগ দিলে কই?

তাই তো। বলে সালমা লজ্জায় যেন গাড়ির সিটের সাথে মিশে যায়। আজাদ আসার পর থেকে এ পর্যন্ত সে তাকে এক মুহূর্ত অবসর দেয়নি। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে-আচ্ছা-আমিই আব্বাকে বলে তোমার ভর্তির ব্যবস্থা করছি। আমি তো ঢাকা সিটি কলেজে ভর্তি হবো। তুমিও সেখানেই ভর্তি হও। তাহলে দু জনে এক সাথে আসা যাওয়া করা যাবে।

না, না, অত বড় কলেজে আমার পোষাবে না। আমাকে কোন ছোট কলেজেই যেন চাচা ভর্তি করে দেয়। আজাদের কথাগুলো করুণ শোনায়।

নিজেকে এত গরীব ভাবো কেন বলতো? তুমি যার কাছে এসেছো তার সম্মান আর তোমার সম্মান এখন এক হয়ে গিয়েছে। আর তুমি এত ভালো রেজাল্ট করে ছোট কলেজে কেন ভর্তি হবে?

আজাদ কি যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ভয়ে থেমে যায়। কি জানি সালমা আবার কোন দিক থেকে আক্রমণ করে বসে কে জানে। ওর কথায় যে ধার–এত সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলা শিখলো কেমন করে সালমা। তাহলে সে–ও কি তার মত সাহিত্য চর্চা করে না কি?

আচ্ছা সালমা, তুমি বই পড়তে ভালোবাসো?

কি–যে বলো। আমার তো সময়ই কাটে বই পড়ে। বাসায় গিয়ে আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহ বই তোমাকে দেখাবো। তুমি বই পড়োনা?

হাঁ–আমিও বই পড়ি আর গান গাইতে–

কি–কি বললে? তুমি গান গাইতে জানো? আনন্দে সালমা আজাদের দিকে মুখ করে একটু কাছে সরে আসে।

না–মানে গাইতে তেমন জানিনা। আমার কণ্ঠ ভালো না।

তা হবে না। আজই রাতে ডিনারের পরেই তোমার গান শুনবো।

এর মধ্যেই গাড়ি এসে বাড়ির গেটে প্রবেশ করে। রাতের অন্ধকার তখন ক্রমে পৃথিবীর উপরে একটা কালো আবরণ টেনে দিচ্ছে। বাড়ির সামনে চাঁদের আলোয় আলোকিত উদ্যানে রকমারী ফুলের সমাবেশ। তার মনমুগ্ধকর সৌরভে বাড়ির সামনের অঙ্গন আমোদিত। ফাগুনের স্পর্শে প্রতিটি বৃক্ষ তরুলতার কিশলয়ে গাঢ় সবুজের মন মাতানো যৌবনের উন্মেষ। দক্ষিণা মলয় সমীরণে পুষ্প শাখা যেন মিলন হিল্লোলে দোল খাচ্ছে। নিজের পরিপূর্ণতার গৌরবে দিগন্তে সৌরভ ছড়িয়ে দিতে ফুলগুলি পাঁপড়ি মেলে দিয়ে ঐ দূর নীলিমায় নিহারীকা পঞ্জের দিকে তাকিয়ে মহা মিলনের ইশারা দিচ্ছে। আজাদের কবি মনে এ দৃশ্য ভাবের সৃষ্টি করে। সে উদাসভাবে বাগানের দিকে তাকিয়ে ছিল। সালমার ডাকে সে যেন চমকে উঠে।

সালমা গাড়ি থেকে নেমে দরোজা খুলে ধরে বলে–নেমে এসো আজাদ ভাইয়া।

এ্যাঁ– আচ্ছা নামছি। দু'জনে সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে যায়। আজাদকে ওর রুম দেখিয়ে দিয়ে সালমা তার আব্বা–আম্মার কাছে গিয়ে বলে, এই যে দেখো আব্বা– আজাদ ভাইয়ার জামা প্যান্ট জুতো। তোমাদের পছন্দ হয়েছে তো?

হ্যাঁ, মা ভালই হয়েছে, আমি তো সব দিকে লক্ষ্য রাখতে পারি না মা – ওর ভালো মন্দের দিকে তুই একটু নজর রাখিস। ওর যা কিছু লাগবে তোর আম্মার কাছে থেকে টাকা নিয়ে তুই–ই কিনে দিস। সালমার আব্বা সালমাকে বলে।

তুমি কিছু চিন্তা করো না আব্বা, তোমার বন্ধুর ছেলের অমর্যাদা যাতে না হয় আমি দেখবো। আর ওতো এবার পরীক্ষায় স্টার পেয়েছে আব্বা– আনন্দ যেন সালমার কণ্ঠে ঝরে পড়ে। ওতো ঢাকাতে ভর্তি হতে এসেছে–

তাই নাকি–তাহলে তুই আর আজাদ একই কলেজে ভর্তি হ– বলেই মেয়ের মুখের দিকে তাকায় মঈন চৌধুরী।

হ্যাঁ আব্বা, আমিও তাই ভাবছি। আর ও নাকি গান গাইতে জানে। আজ ডিনারের পরে ওর গান শুনবো। কালকে ওকে একটা ঘড়ি কিনে দিতে হবে– বলেই সালমা রুম থেকে বের হয়ে নিজের রুমের দিকে যায়।

আজাদের জন্যে নির্ধারিত রুমে সে প্রবেশ করেই তার চোখ ছানাবরা হয়ে যায়। আলোয় ঝলমল করছে ঘরটি। মাথার উপরে ফ্যান। সাদা লম্বা একটি টিউব লাইট তো জ্বলছেই তার উপরে আবার একটি সবুজ লাইট। মেহগনী কাঠের তৈরি বড় খাটের উপরে প্রায় দশ ইঞ্চি মোটা গদি। উপরে বড় বড় ফুল পাতা আঁকা সবুজ চাদর। একই রং এর কভার দেওয়া দু'টো বড় বড় বালিশ। একটি লম্বা কোল বালিশ। এক পাশে বাথরুমের দরজা। ঘরের মধ্যে পাশাপাশি দু'টো দামী সোফা। তার সামনে একটি টি–টেবিল। দক্ষিণ দিকের জানালার সামনে একটি পড়ার টেবিল চেয়ার। টেবিলের উপরে টেবিল ল্যাম্প। জানালা দিয়ে নীচের ফুল বাগান দেখা যাচ্ছে। আজাদ পাজামা পাঞ্জাবী খুলে লুঙ্গী পরতে থাকে আর ভাবতে থাকে বিছানায় বালিশ দু'টো কেন। আর কেউ ওর কাছে শোবে নাকি? সে তো বুদ্ধির বিকাশের পর থেকে এক আদরের রুমী ছাড়া আর কারো সাথে এক বিছানায় শোয়নি। কেউ যদি শোয়–ই তাহলে মাঝখানে সে কোল বালিশ দিয়ে রাখবে। নাহ্, তাহলে এরা বলবে গরীবের আবার ঘোড়া রোগ। তার মত গরীবের এ ধরনের বিলাসিতা মানায় না। এরা ওর মত গরীবকে আশ্রয় দিয়েছে এই অনেক। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাবার ভাষা তার নেই। জামা কাপড়গুলো সে আলনায় রেখে জানালার কাছে বসে ফুল বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার কল্পনা প্রবণ কবি মন চলে যায় দূরে–বহুদূরে সবুজ শ্যামল বনানী আচ্ছাদিত মায়াময় শেখপাড়া গ্রামে। পাখির কলকাকলী মুখরিত ছায়া সুনিবিড় পল্লী বাগানে।

সালমা নিজের রুমে গিয়ে সালোয়ার কামিজ খুলে পা পর্যন্ত লম্বা কালোর উপরে লাল ফুল প্রিন্টের ম্যাকসি পরে ওড়না গায়ে দিয়ে আজাদের রুমে প্রবেশ করতেই দরোজার কাছে থমকে দাঁড়ায়।

আজাদ দরোজার দিকে পিট দিয়ে জানালার কাছে বসে আছে। মাথার ঘন কালো কোকড়ানো চুলগুলো ফ্যানের বাতাসে অবিন্যস্ত ভাবে উড়ছে। অপূর্ব সুগঠিত স্বাস্থ্য। গায়ের রং যেন কাঁচা হলুদ, বৈদ্যুতিক আলোয় অপূর্ব লাগছে। কিছুক্ষণ মোহাবিষ্টের মতই তাকিয়ে থাকে ওর দিকে সালমা। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে ডাকে– আজাদ ভাইয়া, অমন করে কি ভাবছো? বাড়ির কথা মনে পড়েছে বুঝি?

কে? ও সালমা, চমকে ফিরে তাকায় আজাদ। মুখে মৃদু হাসি টেনে বলে– না, ফুল বাগান দেখছিলাম। তুমি দাঁড়িয়ে রইলে যে? বসো।

ই, তুমি কবি–সাহিত্যিক মানুষ, ফুল বাগান তো তোমার হৃদয়ের ক্ষুধা মেটাবে। বসতে বসতে বলে সালমা।

আমি কবি-সাহিত্যিক! বলে আজাদ যেন অবাক হয়ে তাকায় সালমার দিকে।

তাছাড়া আর কি, তোমার ব্রিফকেসে দেখলাম তোমার লেখা অনেক কবিতা, ছোট গল্প। ওগুলো আমার কাছে দিও। আমার এক বান্ধবীর আব্বা একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক, তাকে বলে আমি ছাপানোর ব্যবস্থা করবো।

আজাদের দিকে সালমা তাকায়। আজাদের উন্মুক্ত শরীর কাঁচা হলুদের মত। সুঠাম দেহ। তারুণ্যের শিল্পী যেন তার শরীরে হিল্লোল সৃষ্টি করেছে। তার প্রশস্ত বুকে সদ্য গজানো কালো লোম দু'দিকে বিস্তৃত হয়ে নাভীর দিকে ময়ূরের পালকের মতই নেমে গেছে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সালমা, শিল্পী যেন স্বযত্নে গড়েছেন আজাদের দেহ।

শুধু তাকিয়েই থাকবে সালমা? কিছু বলো। আজাদ জানালার দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে।

না কিছু না। লজ্জায় যেন লাল হয়ে যায় সালমা। সে মাথা নীচু করেই বলে- গেঞ্জিটা গায়ে দিয়ে চলো খাবার টেবিলে যাই। খাওয়ার পরে আজাদ কুণ্ঠিত ভাবে সালমাকে বলে- আজকে গান না শুনলে হয়না সালমা।

কেন?

ক্লান্ত লাগছে-

তাহলে আজ থাক। কালকে শুনবো। এখন নিজের রুমে গিয়ে ঘুমাও গে। দরোজা বন্ধ করে দিও। নইলে ঐ রবিন গিয়ে ডিস্টারব করবে। বলেই সালমা ডাইনিং টেবিলের নিচে নাদুস নুদুস স্বাস্থ্যের এক বিড়ালের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

আজাদ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। যাক তার কাছে তাহলে কেউ শুচ্ছে না। সে তার রুমে গিয়ে দরোজা বন্ধ করবে এমন সময় আবার সালমা এসে বললো- এক মিনিট তোমাকে ডিস্টারব্ করতে এলাম। আজাদ স্বহাস্যে ওর মুখের দিকে তাকায়। কোন লাইটের কোন সুইচ্ সালমা তাকে বুঝিয়ে দিয়ে বলে এক্ষুনি শুয়ে পড়ো, কাল সকাল সকাল তোমাকে নিয়ে অনেক জায়গায় যাবো।

আমার তো এত তাড়াতাড়ি ঘুম আসবে না। তোমার কাছে অনেক বই আছে বলেছিলে- একটা এনে দিলে পড়তাম।

যখন ঘুমাবেই না তাহলে বই পড়াও হবেনা। তোমার বাড়ির গল্প করো শুনি। বলেই সালমা সোফার উপরে বসে পড়ে।

বাড়ির গল্প আর কি করবো- এক ভাইয়া, ভাবী আর পাঁচ বছরের রুমী। আচ্ছা ভাইয়ার মুখে শুনেছিলাম তোমরা নাকি তিন বোন তিন ভাই- বাড়িতে তো কাউকে দেখছিনা। বলেই আজাদ আগ্রহে সালমার মুখের দিকে তাকায়।

ও, ভাইয়া আপারা! ওরা তো কেউ বাড়িতে নেই তাই কাউকে দেখোনি। বড় আপা আর মেঝ আপা দুলা ভাইয়াদের সাথে আমেরিকায় থাকে। বড় ভাইয়া ব্যবসায়ের কাজে সিঙ্গাপুর। মেঝ ভাইয়াও চট্টগ্রাম পোর্টে গেছে মালামাল খালাস করতে। আর ছোট ভাইয়া

তো অক্সফোর্ডে লেখাপড়া করে। এখন বাড়িতে আব্বা-আম্মা, বড় ভাবী, মেঝভাবী আর আমি আছি।

তাহলে বিকালে তোমাদের বাগানের ঐ পাশে অনেককে দেখলাম ওরা কারা?

ওঃ ওরা তো আমার আর ভাইয়াদের বন্ধু বান্ধবীরা প্রতিদিনই বলতে গেলে ওরা এখানে খেলতে আসে। আচ্ছা অনেক হলো এবার তুমি ঘুমাও- বই কালকে দেব। বলেই সালমা সোফা ছেড়ে উঠে চলে গেল।

আজাদ ঘরের দরোজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে বেড সুইচ টিপে লাইট নিভিয়ে দেয়। ক্লান্তিতে সারাটা শরীর যেন ভেঙ্গে পড়তে চাইছে। কিন্তু ঘুম কেন আসছে না। মরার মত সে চোখ বন্ধ করে পড়ে ভাবতে থাকে- এখানে এরা তাকে অত্যন্ত সমাদরেই গ্রহণ করেছে। কিন্তু এখনো সে চৌধুরী চাচার কাছে তার ভর্তির কথাই বলতে পারলো না। সালমা অবশ্য তাকে একই কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য বলেছে। তবুও চাচার মতামত জানা দরকার। তাকে মানুষের মত মানুষ হতেই হবে। লেখাপড়ার ব্যাপারে ঢাকার ইসলামী সংগঠনের ভাইদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। ওদের কাছে থেকে সাহায্য নিলে রেজাল্ট ভালো হবে ইনসাল্লাহ। আর কলেজে ভর্তি হয়েই একটা হাতের কাজ শিখতে হবে। টেলেক্স ফ্যাক্স না হয় কম্পিউটার। নিজের লেখাপড়া মানুষকে সংগঠনের মাধ্যমে ইসলামের দিকে আহবান, আর টেকনিক্যাল ওয়ার্ক শেখা নিয়ে সে ব্যস্ত থাকবে। বিন্দু পরিমাণ সময় অপচয় সে করবে না। তার ভাই-ভাবী আর রুমী তারই মুখের দিকে চেয়ে আছে।

কিন্তু সালমা, সালমা তার সাথে আজ প্রথম দিনেই এমন খোলামেলা ব্যবহার করলো কেন। বোধ হয় সে তার আব্বার ঋণ শোধ করতে চাইছে। এর বেশি কিছু না। সে জন্যেই মেয়েটি তাকে আপনজন বলে সম্বোধন করেছে। মেয়েটার চোখের চাহনি বড়ই সুন্দর! অপূর্ব ওর হাসি যেন সহজেই অপরের হৃদয়ে আসন করে নেয়। যাকগে, এই উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত সে কোন মেয়েকে হৃদয়ে স্থান দেয়নি আর দিবেও না। কিন্তু সালমার মিষ্টি হাসিটা কেন ওর চোখ থেকে মুছে যাচ্ছেনা। বার বার ঘুরে ফিরে সালমা যেন তাঁর সামনে এসে ওর ভুবন মোহিনী রূপ নিয়ে দাঁড়াচ্ছে। কানের কাছে শুধু ওর বলা কথা গুলো ভেসে আসতে থাকে- কি বললেন, আপনি কি আমাদের আপন নন? এক সময় গভীর ঘুম নেমে আসে আজাদের চোখে।

ফজরের আজানের শব্দে আজাদ ধরমড়িয়ে উঠে বিছানায় বসে। আহ্, আজানের কি মধুর ধ্বনী। সে বইতে পড়েছিল ঢাকা মসজিদের শহর। এখন যেন মনে হচ্ছে প্রতিটি বাড়ি থেকেই মাইকে আজানের ধ্বনী হিল্লোল তুলেছে। মোয়াজ্জিনের সুমধুর আল্লাহু আকবার ধ্বনীতে মন চলে যায় এক বেহেশ্তী পরিবেশে। দেহমন এক মহা পবিত্র হৃদে অবগাহন করতে থাকে। আজাদ বেড সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে বাথরুমে যায়।

নামাজ আদায় করে সে তার কুশল সংবাদ জানিয়ে ভাই ভাবীর কাছে পত্র লিখে টেবিলের উপরে বই চাপা দিয়ে রেখে রুমের বাইরে আসে। সূর্য উঠার এখনো অনেক দেরী- আর একটু ঘুমুলে হয় না। সে আবার বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

ছয়

সালমার অভ্যাস খুব ভোরে শয্যা ত্যাগ করা। তারপর গোসল সেরে মাথা আঁচড়িয়ে মুখ মন্ডলে হালকা প্রসাধনী দিয়ে এক কাপ চা খেয়ে বই নিয়ে আর না হয় গিটার নিয়ে বসা।

আজ সে গিটার নিয়ে না বসে পায়ে পায়ে আজাদের রুমের দিকে এসে দেখে রুমের দরোজার এক পাল্লা খোলা। সে-ভাবে আজাদ বোধহয় নামাজ আদায় করতে উঠে রুমের বাইরে এসেছিল কিন্তু গেল কোথায়? খোলা দরোজা দিয়ে রুমে উঁকি দিতেই তার চোখে পড়ে আজাদ বিছানায় অঘোরে ঘুমুচ্ছে। একখানা পা তার ভাজ হয়ে আছে। মাথাটা বালিশের এক দিকে কাত হয়ে পড়েছে। যদিও তার দেহ চিৎ হয়ে আছে। ডান হাতটা দিয়ে কোল বালিশ আলতো ভাবে ধরে আছে। হয়তঃ বাড়িতে সে এভাবেই তার আদরের রুমীকে ধরে ঘুমায়। সবুজ চাদরের উপরে আজাদের উজ্জ্বল বর্ণের শরীর দেখে সালমার কাছে মনে হয়, যেন সবুজ লতা পাতার মধ্যে লুকায়িত পাকা আপেল। সে কিছুক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে ঘুমন্ত আজাদের মৃদু স্পন্দিত শরীরের দিকে তাকিয়ে থেকে নীরবে রুমে প্রবেশ করে টেবিলের দিকে এগিয়ে যায়। টেবিলের উপরে একটি সদ্য লেখা খোলা চিঠি। ভাই ভাবীকে সম্বোধন করে লিখা।

এখানে তাকে এরা কিভাবে গ্রহণ করেছে, আসার সাথে সাথে তাকে সবাই কেমন আদর করেছে, বিশেষ করে সালমা তার জন্য কি করেছে সবই লিখেছে। রুমীর লেখাপড়া খাওয়ার দিকে ভাবীকে নজর দিতে বলেছে। ভাই ভাবীকে তার জন্যে কোন প্রকার চিন্তা করতে নিষেধ করেছে আরো কত কি! সালমা পত্র পড়ে মৃদু মৃদু হাসতে থাকে। আজাদকে সে কি ডাকবে- নাহ্, ঘুমাচ্ছে ঘুমাক। নাস্তা রেডি করে তার পরেই ডাকবে। সে রুম থেকে বের হয়ে নীচে ফুল বাগানে এসে নিজের পছন্দ মত অনেক গুলো সদ্য ফোটা ফুল তুলে একটি ফুলদানিতে সুন্দর করে সাজিয়ে আজাদের রুমে টেবিলের উপরে রেখে নিজের রুমে প্রবেশ করে নজরুলের রিক্তের বেদন নিয়ে সোফায় বসে।

হঠাৎ আজাদের ঘুম ভেঙ্গে যেতেই টেবিলের উপরে তার নজর পড়ে। ফুলদানিতে কয়েকগুচ্ছ নানা ধরনের ফুল- আশ্চর্য! এই সাত সকালে টেবিলে ফুল এলো কোথা থেকে? সালমা দিয়ে যায় নি তো? ও ছাড়া আর কে আছে এ বাড়িতে যে ওর রুমে প্রবেশ করবে- সালমাই দিয়ে গেছে। মেয়েটার মনের ভাব কি? দুত্তোর, তার মত এক পাড়াগাঁয়ের দরিদ্র যুবকের চেয়ে অনেক সুন্দর গাড়ি বাড়িওয়ালা যুবক এই ঢাকা শহরে আছে তাদের বাদ দিয়ে ওর কাছে প্রেম নিবেদন করতে আসবে সালমা- খেয়ে দেয়ে বুঝি আর কাজ নেই। ওরা ধনী মানুষ বিলাসী তাই ফুল নিয়েও ওরা এক ধরনের বিলাসিতা করে। আজকের ফুল দেওয়ার মধ্যে কোন প্রেম টেম নেই। ভাবতে ভাবতে সে খাট থেকে নেমে ফুলদানি থেকে একটি লাল গোলাপ উঠিয়ে নিয়ে ঘ্রাণ নিতেই তার চোখ যায় জানালার বাইরে। সকালের সোনালী রৌদ্র

বাগানে ঝলমল করছে। ডান হাতে ধরা নাকের কাছে লাল গোলাপ। আজাদ বাইরে প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখছে। পূর্ব আকাশে নতুন সূর্য উদিত হয়ে গোটা পৃথিবীকে আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলেছে। তার সোনালী কিরনচ্ছটায় দুর্বা ঘাসে পড়ে থাকা রাতের শিশির বিন্দুগুলো মুক্তার মতই চমক সৃষ্টি করেছে। আজাদ যেন অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠে- অপূর্ব!

অপূর্ব কি?

ঐ যে- ঐ যে ঐ মুক্তোর কনাগুলো। প্রকৃতির শ্যামল বুকে যেন প্রেয়সীর গোলাপী মুখের কালো তিল। আজাদ গুণ-গুনিয়ে উঠে-

তোমার সৃষ্টি যদি হয় এত সুন্দর
না জানি তাহলে তুমি কত সুন্দর।
সেই কথা ভেবে ভেবে কেটে যায় লগ্ন
ভরে যায় তৃষিত এ অন্তর,
না জানি তাহলে তুমি কত সুন্দর, কত সুন্দর।"
অপূর্ব - অপূর্ব! ধন্য হে কবি তোমার প্রকৃতি দর্শন।

কে? ও সালমা। সে চমকে ফিরে তাকায়। দেখে সালমা ওর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। কখন এসেছো তুমি? বসো বসো। বলেই আজাদ স্বলজ্জ দৃষ্টিতে সালমার দিকে তাকায়।

না, বসবো না। চলো নাস্তা খাবে।

তুমি নাস্তা করেছো?

কি করে তুমি ভাবতে পারলে, তোমাকে নাস্তা না খাইয়ে আমি খাবো? সালমার কথায় কোথায় যেন এক সুরের ইশারা।

আজাদ বিহ্বল হয়ে পড়ে। এ বাড়িতে তার জন্যে না খেয়ে কেউ থাকবে এ তো আকাশ কুসুম কল্পনা। সে কুণ্ঠিত ভাবে মাথা নীচু করে বলে- নামাজ আদায় করে শুয়ে পড়েছিলাম, তুমি আমার জন্যে কষ্ট পেলে সালমা।

না, না, কষ্টের এমন তুমি কি দেখলে? আর এ সময়ে না ঘুমালে তোমার আসল রূপ তো আমার কাছে প্রকাশ পেতো না।

আজাদ সালমার কথার অর্থ বুঝতে না পেরে অবাক চোখে ওর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে মৃদু কণ্ঠে বলে- তোমার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারলাম না ঠিক-

শোন- তুমি নামাজ আদায় করে ঘুমিয়ে পড়লে। তারপর ঘুম থেকে উঠেই তোমার চোখে পড়লো প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্য। তুমি স্রষ্টার সৃষ্টির রূপে মুগ্ধ হয়ে যা বললে তা সবই আমি শুনেছি- তোমার সৃষ্টি যদি হয় এত সুন্দর , না জানি তাহলে তুমি কত সুন্দর। তোমার এই কথাগুলোর মধ্যেই তোমার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়। এখন চলো, পেটে কিছু দিয়ে তারপরে তোমাকে নিয়ে বের হবো।

সালমার কথায় লজ্জায় যেন আজাদ আড়ষ্ট হয়ে যায়। সে এমনভাবে ওর কাছে ধরা পড়বে তা ভাবতেও পারেনি। তার ভাব প্রবণ কবি মন নিজের অজান্তেই কি বলেছে না বলেছে সালমা সবই তাহলে শুনেছে। সে লজ্জিত কণ্ঠে বলে উঠে– ফুল দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।

সালমা হাসতে হাসতে বলে – তোমাকে ফুল দিয়ে আমি ভুল করেছি আজাদ ভাইয়া।

আজাদ যেন হঠাৎ ধাক্কা খায়। সে করুণভাবে ওর মুখের দিকে তাকায়। বলে– তোমাকে ধন্যবাদ দেওয়াতে তুমি মাইন্ড করলে সালমা।

আর দূর বোকা মাইন্ড করবো কেন, তোমাদের কবি টবি নিয়ে হলো এই বিপদ। বলবো একটা আর বুঝবে আর একটা। আমি বললাম যে কারণে তাহলো ফুল যেমন নিজে গন্ধ ছড়ায়, নিজের সুবাসিত সৌরভে অপরকে আকৃষ্ট করে, কবিরাও তো তেমনি তাদের কাব্যের মাধ্যমে তা-ই করে। কবিরা তো নিজেই ফুল তাই ফুল দিয়ে ওদের হৃদয়কে ফুলের পাপড়িতে বন্দী করার পক্ষপাতি অন্তত আমি নই। কথা বলতে বলতে ওরা এসে নাস্তার টেবিলে বসে।

নীচে হঠাৎ করে কার যেন কান্না শোনা যায়। আজাদ পাউরুটির সাথে জেলি মাখাতে মাখাতে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে সালমার দিকে তাকায়। এই সেরেছে– আজও আবার মুঙ্গলা বোধ হয় ওর বউকে পিটিয়েছে। সালমা যেন হাসিতে গড়িয়ে পড়বে।

মুঙ্গলা মানে কি সালমা। আজাদ জিজ্ঞেস করে।

আর বলোনা, ওরা দু' জনই আমাদের বাড়িতে কাজ করে। থাকে আমাদের গ্যারেজের পাশের রুমে। খুবই সৎ। ও নাকি মঙ্গল বারে ভূমিষ্ট হয়েছিল, তাই ওর মা নাম রেখেছে মুঙ্গলা। মাঝে মধ্যেই স্বামী স্ত্রী গন্ডগোল লাগিয়ে আমার কাছে আসে বিচারের জন্যে।

ইতিমধ্যে মেঘের মত কালো চেহারার ত্রিশ পয়ত্রিশ বছর বয়সের এক লোক সাথে আগে আগে বিশ পঁচিশ বছর বয়সের এক মহিলা ফুঁফিয়ে কাঁদতে কাঁদতে এসে ডাইনিং টেবিলের কাছে সালমার পাশে দাঁড়িয়ে অনুযোগের সুরে ওদের আঞ্চলিক ভাষায় বলতে থাকে– দেখিইছো আপামনি এ ড্যাকরা আজকি আবার আমারে মাইরি পিট ফুলিই দিইছে।

দ্যাখ্ গ্যাদার মা, মুখ সাম্‌লিই কথা কইবি। আবার যদি ড্যাক্‌রা বলিস–

তুমি থামতো মুঙ্গলা– সালমা ধমকে উঠে। ওর প্রশ্রয় পেয়ে গ্যাদার মা বলতে থাকে– দেখিই ছেন আপামনি আপনার সামনিই কি করে?

এই মিন্‌সি, তুই আমারে মারলি কিসির জন্যি?

আমি তোমারে মারিলাম, সেকি ইচ্চা করি মারিলাম। আমি ডাকিলাম কতবার, তাও তুমি আস্‌লে না। তাই তো আমি রাগ করি মারিলাম।

রাগ করি মরিলাম–হ। রুটি বেলনা ফিঁড়ি দিয়ে আমার পিটির উপিরে হ্যাঁকাত্ করে ম্যারি আমার পিট ফুলিই দিয়েছে আপামনি।

আজাদ নাস্তা খাওয়া বন্ধ করে ওদের স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া উপভোগ করতে থাকে। সালমার ভাবীরা বের হয়ে দেখতে থাকে।

আচ্ছা মুঙ্গলা তুমি হাতের কাছে যা পাও তা দিয়েই কেন মারো? সালমা রাগতঃ ভাবে মুঙ্গলাকে বলে।

আপামনি আপ্‌নি বিচার করিয়েন। কোলের গ্যাদা ছাওয়ালডা ঘরির মেঝেই পড়ি কান্‌তি কান্‌তি আকাটা ম্যারি গেল– আমি ওরি গ্যাদার মা গ্যাদার মা বলি ডাক্‌তি ডাক্‌তি গলা ফাটিই ফ্যাললাম। তাও ঐ ঝাটা খাকি আসে না। পায়খানায় গিই ও মরিই ছিলি।

আচ্ছা গ্যাদার মা, আর মারবেনা মুঙ্গলা তোকে। এখন যা, সালমা ওদের বিদেয় করে হাসিতে যেন ফেটে পড়ে।

এতক্ষণ তো বিচার করলে– এবার নাস্তা খাও। আজাদও নাস্তার দিকে মন দেয়। নাস্তা শেষে সালমা বলে–জলদি রেডি হয়ে নাও। আর হ্যাঁ, গতকালকে নিউ মার্কেট থেকে আনা প্যান্ট সার্ট জুতো পরবে। আমিও তৈরি হয়ে নিচ্ছি। বলেই সালমা নিজের রুমের দিকে চলে যায়।

আজাদ নতুন প্যান্ট সার্ট পরে ভাবতে থাকে– সালমা আজ তাকে কোথায় নিয়ে যাবে? ওর বন্ধু–বান্ধবীদের সাথে পরিচয় করে দিতে নয় তো? আর পরিচয় করে দিলেও কি বলে পরিচয় করিয়ে দিবে? পিতার বন্ধুর ছেলে? অথবা গ্রাম থেকে এসেছে তাদের বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করার জন্যে? না ওদের আশ্রিত বলে? নাহ্, ওকে এতটা ছোট করবে না সালমা। ইতিমধ্যে সালমা এসে আজাদের রুমে প্রবেশ করতে করতে বলে – চলো, আব্বা–আম্মা তোমাকে ডাকছে। বলেই নতুন পোষাক পরা আজাদের দিকে সালমা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়। ওর পাতলা দু' ঠোঁটে ফুটে উঠে তৃপ্তির হাসি।

আজাদ চৌধুরী চাচার রুমে প্রবেশ করে ছালাম দেয়। সালমার আব্বা–আম্মা স্নেহের দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে কোমল কণ্ঠে বলেন– এ বাড়িকে তোমার নিজের বাড়ি বলেই মনে করবে বাবা, আর যখন যা তোমার দরকার, তোমার চাচীমাকে বলবে। তুমি আর সালমা ঢাকা কলেজেই ভর্তি হও। কাল পরশু বোধ হয় ফাহাদ আর শাহেদ বিদেশ থেকে আসবে। ওরা এলেই তোমাদেরকে কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে নিয়ে যাবে। বাড়িতে চিঠি লিখে জানিয়ে দিচ্ছি শফিককে, যে তুমি ভালো আছো।

চাচা, আমি বলছিলাম কি অত বড় কলেজে অনেক টাকা লাগবে। তার চেয়ে কোন কম পয়সার কলেজে আমাকে ভর্তি করে দিলেই আমার চলতো।

তোমার চলতো – কিন্তু আমাদের চলতো না আজাদ ভাইয়া। নিজেকে এত ছোট ভাবতে নেই। মনে রেখো তুমি আসাদ চৌধুরীর ছেলে। সালমা কথাগুলো যেন রাগ ভরে বলে।

না বাবা, তুমি কম পয়সার কলেজে ভর্তি হবে কেন। এত ভালো রেজাল্ট করেছো। আর যত পয়সারই প্রয়োজন হোক, আমাদের আর একটা ছেলে থাকলে আমরা কি ওর পেছনে

পয়সা খরচ করতাম না? শাকিলের জন্যে প্রতি মাসে ইংল্যান্ডে কত টাকা দিতে হচ্ছে, আর তোমার পিছনে কেন পারবো না বাবা। সালমার আম্মা কথাগুলো বলে পান বানাতে থাকেন। আজাদ এবার কুণ্ঠিত ভাবে বলে– চাচী, লেখাপড়ার পাশাপাশি যদি একটা হাতের কাজ শিখতে পারতাম।

বেশ তো শিখবে, আমি আজই আমার অফিসের ফ্যাক্স টেলেক্স কম্পিউটার ইনচার্জকে ডেকে বলে দিবো। তোমার যখন মন চায় যা শিখতে চাও শিখে নিও। চৌধুরী চাচা আজাদকে স্বস্নেহে কথাগুলো বলেন।

এবার সালমার দিকে তাকিয়ে তার আব্বা বলেন – দেখিস মা, ওকে যেখানে সেখানে নিয়ে যাস না। পাড়া গাঁয়ের ছেলে লক্ষ্য রাখিস। আমার বন্ধুর ছেলে বলে পরিচয় না দিয়ে আমার বড় ভায়ের ছেলে বলে পরিচয় দিস।

সেটা তুমি না বললেও আমিই দিতাম। এখন আমাকে কিছু টাকা দাও, একটা ঘড়ি কিনতে হবে।

ঘড়ি কিনতে হবে না। গতরাতে ফোনে শাকিলের সাথে কথা হয়েছে এক সপ্তাহের মধ্যেই ও আসছে। আমি বলে দিয়েছি ঘড়ি আনবে।

ছোট ভাইয়া আসছে আব্বা– আমার জন্যে কি আনবে ? খুশিতে সালমার মুখ যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠে। আচ্ছা, এখন আমি আসি আব্বা। বলেই সালমা ওকে আসতে বলে। আজাদ আবার ছালাম জানিয়ে ওর পিছু নেয়।

সালমা আজ হালকা গোলাপী রংএর সালোয়ার কামিজ পরেছে। চোখে মুখে সামান্য প্রসাধনী, গাড়ির জানালা দিয়ে বাতাস এসে তার রেশমী চুলগুলো বার বার অবিন্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। আজাদ ওর দিকে তাকিয়ে বলে– কোথায় নিয়ে যাচ্ছো সালমা ?

যেখানে তুমি তোমার মনের খাদ্য পাবে।

আমার মন কি চায় – তা তুমি কি করে বুঝলে ?

আমার না বুঝলে চলবে কেমন করে, তাই বুঝতে হয়।

তা এই দু'দিনেই কি সব বুঝলে?

অন্তরের চোখ দিয়ে কাউকে বুঝতে চাইলে দু'দিনের প্রয়োজন হয় না। মাত্র দু'মিনিটের প্রয়োজন। বলেই সালমা উদাস দৃষ্টি মেলে জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকে।

আজাদ গাড়ির জানালা দিয়ে ব্যস্ততম ঢাকা শহর দেখতে থাকে আর ভাবতে থাকে– সালমা তাহলে তাকে অন্তরের চোখ দিয়ে দেখেছে– কিন্তু কেন? কি জন্যে তাকে সালমা এত গভীরভাবে দেখে।

নীরবতা ভঙ্গ করে আজাদের দিকে তাকিয়ে সালমা বলে ওঠে– কি ভাবছো আজাদ ভাইয়া?

কই কিচ্ছুনা তো। তা কোথায় যাচ্ছো বললে না তো।

আজ তোমাকে ঢাকায় দেখার মত জায়গাগুলো দেখাবো। তারপর চিড়িয়াখানা। কালকে নিয়ে যাবো বোটানিক্যাল গার্ডেনে।

পরের দিন ওরা বোটানিক্যাল গার্ডেনে যায়। দু'জন পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। কিন্তু কারো মুখে কোন কথা নেই। উভয়ের মাঝে এক অখন্ড নীরবতা যেন বাসা বাঁধে। আজাদ মুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রকৃতির অপরূপ শোভা নয়নাভিরাম নৈসর্গিক দৃশ্য দেখছে আর পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

সে যেন ভুলেই গিয়েছে যে তার পাশাপাশি সালমাও হাঁটছে। হঠাৎ সালমা বলে উঠে– কিছু বলো, আজাদ ভাইয়া –

কি বলবো সালমা ?

যা হোক কোন কথা বলো।

কথা না বলেও তো অনেক কথা বলা যায় সালমা।

কিভাবে ?

ঐ যে দেখো ফুলের শাখাগুলো, পরস্পরে ওরা কত কথা বলছে।

কিন্তু আমি তো ফুলের শাখা নই। আমি মানুষ, আমার মুখে ভাষা আছে আর ভাষার উৎকর্ষতার জন্যে আমি ক্রমাগত সাধনা করছি।

তা ঠিক, কিন্তু পরস্পরের হৃদয় যেখানে নীরবে কথার বিনিময় করে সেখানে মুখের ভাষা তো গৌন হয়ে যায় সালমা। আজাদ তার ডান হাত তুলে আঙ্গুল দিয়ে একটি সূর্যমুখী ফুলের দিকে দেখিয়ে আবার বলে– ঐ যে ভ্রমরটিকে দেখো, যখন প্রকৃতির মহাশূন্যে অবস্থান করেছে তখন সে বিরহ বেদনায় এক ধরনের গুঞ্জন করছে। আর এখন প্রেয়সী ফুলের সান্নিধ্যে নীরব হয়ে আছে। ওখানে ভাষার প্রয়োজন নেই সালমা। ওরা হৃদয় দিয়েই কথার মালা গাঁথছে।

আজাদ বুঝলোও না সে সালমার হৃদয় বীণায় এ সমস্ত কথা দিয়ে কোন বিরহী সুর সৃষ্টি করলো। সে যদি এ মুহূর্তে সালমার দিকে তাকিয়ে দেখতো তাহলে দেখতে পেতো সালমার চোখে সব পাওয়ার আনন্দে কি তরঙ্গ খেলা করছে। কত উৎফুল্ল দৃষ্টিতে সে তাকে দেখছে। আজাদের ভাবুক মন জানে না তার কোন কথা সালমার আঘাত না পাওয়া হৃদয় বীণায় গুঞ্জরণ সৃষ্টি করে।

তুমি প্রকৃতিকে এত গভীরভাবে উপলব্ধি করো আজাদ ভাইয়া ?

হ্যাঁ, আমরা যার সৃষ্টি সেই স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতি অনুসন্ধানী দৃষ্টি দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। যদিও তার সৃষ্টি নিপুনতার কণামাত্র আমরা আবিষ্কার করতে পারবো না।

তাহলে দৃষ্টি দেওয়ার সার্থকতা কোথায় ?

নিজেকে জানা –উপলব্ধি করাতেই তো সার্থকতা সালমা।

সূর্যকে কিভাবে তুমি দেখবে ?

ওকে দেখতে হয়না সালমা। পৃথিবীর এই সবুজ শ্যামল আভা-চিত্তাকর্ষক দৃশ্যাবলীই ওর অস্তিত্ব স্বগৌরবে ঘোষণা করছে।

বড্ড কঠিন হয়ে গেল যে।

কঠিন কোথায় দেখলে, সূর্যের আলো ছাড়া পৃথিবীতে কোন প্রাণের স্পন্দন কল্পনা করা যায় না। আর এখানেই আল্লাহর অদ্বিতীয় নেয়ামত ঐ সূর্যের প্রকাশ। ওকে দেখতে উপরে তাকাতে হয়না।

আচ্ছা তুমি কিন্তু বলেছিলে আজ গান শোনাবে।

গান - গান শুনবে। তোমার কান দু'টো সজাগ করো দেখবে শত কোটি কণ্ঠে অপূর্ব গানের সুর তোমার কানের কাছে আছড়ে পড়ছে।

গানের সুর আমার কানের কাছে- সেকি?

পাখ-পাখালী, বৃক্ষ তরুলতা গভীর অরন্যানী, অগাধ জলধী ঐ দূর গগনের নীহারিকা কুঞ্জ, শ্রাবনের ক্রন্দসী আকাশের একটানা রিমঝিম শব্দ এসব কি গান গাইছে জানো সালমা? আল্লাহ্ আল্লাহ্ রবে প্রতিটি মুহূর্তে তারা গান গাইছে। সে যাক, আজ আমিও তোমাকে গান শুনাবো।

আজাদ ভাইয়া, আজ থেকে আমি গল্প লেখা ছেড়ে দিলাম।

কেন সালমা? আমার টেবিলের নীচের ড্রয়ারে অনেকগুলো সাপ্তাহিক মাসিক পত্রিকা দেখেছি। ওর মধ্যে তোমার লেখা অনেকগুলো গল্পও এর মধ্যেই আমি পড়েছি। ভালই তো হয়েছে।

তুমিও কি ওদের দলে ?

কাদের দলে ?

ঐ যে আমার ভাইয়ার বন্ধু এবং আমার ক্লাস ফ্রেন্ডদের।

বুঝতে পারলাম না।

মানে ওরা যেমন আমার লেখার প্রশংসা করে।

ওদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখো, তোমার লেখার বিষয়বস্তু কিছুই ওরা বলতে পারবেনা। ওরা তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে তোমার করুণা ভিক্ষার জন্যে বলে তোমার লেখা খুব ভালো। না পড়েই বলে।

আর তুমি ? সালমা গভীর আগ্রহে আজাদের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়।

আমি আল্লাহর করুণা ছাড়া এ জীবনে আর কারো করুণা ভিক্ষা করিনি করবোও না। আমি ওদের দলে নই। তোমার লেখা পড়েই বলেছি।

সালমার কথা যেন হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। সে কি বলতে কি বলে ফেললো আজাদকে। সে তো ঐ হ্যাংলা তরুণ-যুবকদের মত উচ্ছৃংখল নয়। ওতো নিজেই প্রদীপ-শুধু আলো দান করে। ওর দিকে সবাই তাকিয়ে থাকে। ও কারো দিকে তাকায় না। তেল শেষে নিজেই

হারিয়ে যায়। তাহলে সে- এ কি করলো। ওদের বাড়িতে আজাদ আছে বলে সে কোন প্রতিবাদ করবে না কিন্তু ওর কবি হৃদয় তো রক্তাক্ত হয়ে যাবে। তাহলে সে কি ক্ষমা চাইবে? হ্যাঁ সে ক্ষমাই চাইবে। অনুতাপ আর লজ্জা জড়িত কণ্ঠে সালমা বলে- আমাকে ক্ষমা করে দিও।

কেন, কি হয়েছে ক্ষমা করার।

ঐ যে আমি তোমাকে ওদের দলের বলেছি। চোখ দু'টো ছল ছল করে সালমার।

না, না, ক্ষমা চাচ্ছো কেন তুমি! এটা হচ্ছে তোমার দীনতা। তোমার কাছে দীনতা মানায় না।

তাহলে?

বই পড়লে অজ্ঞতা নিজের কাছেই ধরা পড়ে। তুমি আরো বেশি বই পড়লেই তাহলে মিছে প্রশংসার ফানুস তোমার কাছে ধরা পড়বে।

ফানুসেরও কিন্তু সৌন্দর্য আছে।

অস্বীকার করিনা- আছে। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী, উপরে উঠলেই ওর মৃত্যু হয়। তুমি কিন্তু লেখা বন্ধ করবে না।

আদেশ না অনুরোধ করছো ?

না মানে - আদেশ করবো কেন।

তাহলে লেখা বন্ধ করে দিব। আদেশ করলে ভালো হোক মন্দ হোক লেখতাম।

আচ্ছা আদেশই করলাম, তুমি লিখবে। বলেই আজাদ হেসে ওঠে। সালমাও সে হাসিতে যোগ দেয়।

সালমা, তোমার লেখায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কথা থাকতে হবে। তাদের আদর্শ বিশ্বাস সভ্যতা নৈতিকতা ইত্যাদির প্রতিফলন ঘটতে হবে। তবেই না তুমি সার্থক হবে, তোমার লেখা একটা রূপ নিবে।

তোমার কথা ঠিক বুঝলাম না আজাদ ভাইয়া।

আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান-ইসলাম তাদের প্রিয় আদর্শ-

বুঝেছি কিন্তু আমি যে ইসলাম সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি না।

ঠিক আছে, আমি ইসলাম সম্পর্কে সব ধরনের বই-পুস্তক যোগাড় করে দিচ্ছি। ও গুলো অধ্যয়ন করলেই তুমি সবই জানতে পারবে। আচ্ছা, গোটা বোটানিক্যাল গার্ডেনই তো ঘুরে দেখলাম এখন কোথায় যাবে?

আজকে আর কোথাও নয় - এখন সোজা বাসায়।

সাত

জয়নুল, আমার নামে কোন চিঠি আছে?

হ্যাঁ শফিক ভাইয়া, আপনার নামে ঢাকা থেকে দু'টো চিঠি এসেছে। শফিকের জিজ্ঞাসার উত্তরে পিয়ন জয়নুল দু'টো চিঠি বের করে শফিককে দেয়। আজাদ ঢাকা যাবার দু'দিন পর থেকেই শফিক পিয়নের সাথে দেখা হলেই চিঠির কথা জিজ্ঞাসা করে।

পিয়ন প্রতিদিনই স্কুলের নানা ধরনের চিঠি নিয়ে এসে স্কুলে দিয়ে তার দোকানে আসে চা খেতে। সেদিন যখন পিয়ন শফিককে দু'টো চিঠি দিল শফিক তাড়াতাড়ি চিঠি দু'টো খুলে পড়েই বলে ওঠে- আলহামদুলিল্লাহ।

পিয়ন জয়নুল জিজ্ঞেস করে- কোন সুসংবাদ, শফিক ভাইয়া?

এর থেকে খুশীর খবর আমার কাছে আর নাই জয়নুল। আমার আজাদ ঢাকা থেকে পড়ালেখার সুযোগ পেয়েছে। ও ঢাকা কলেজে ভর্তি হচ্ছে। আমার তো আর পড়ানোর ক্ষমতা নেই - আল্লাহই ওর ব্যবস্থা করে দিল।

আজাদ ঢাকা কোথায়- কার কাছে থেকে লেখাপড়া করবে?

আমার মরহুম আব্বার বন্ধুর বাড়িতে থেকে- বলেই শফিক পিয়নকে একটি প্লেটে অনেকগুলো বিস্কুট আর কলার ছড়া থেকে দু'টো বড় বড় কলা ছিড়ে দেয়। বলে- খাও জয়নুল, আর আমার আজাদের জন্যে দোয়া করো। শফিক চা তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

এত কি হবে শফিক ভাইয়া, এত পয়সা কোথায় যে আমি খাবো?

আজ তোমাকে পয়সা দিতে হবেনা, খাও। খেয়ে আমার ভাইয়ার জন্যে দোয়া করো।

শফিক আজকে তাড়াতাড়িই দোকান বন্ধ করে ক্রাচে ভর দিয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা দেয়। পথে যার সাথেই দেখা হয় তাকেই আজাদের সৌভাগ্যের কথা সে জানায়। আনন্দ উচ্ছ্বাস শফিকের চোখে মুখে যেন উপচে পড়ছে। মঈন চাচা এতদিন তাদের কোন সংবাদ নেয়নি বলে বার বার ক্ষমা চেয়েছে পত্রে। আজাদের জন্যে কোনরূপ চিন্তা করতে নিষেধ করে লিখেছে - আজাদ তারই সন্তান। ওর সমস্ত তার সে-ই বহন করবে। তাহলে মঈন চাচার মত ধনী মানুষ তাদের কথা মনে রেখেছে? এ কম সৌভাগ্যের কথা নয়। আজাদও লিখেছে - তাকে মঈন চাচা ও চাচী আপন সন্তানের মতই গ্রহণ করেছে। যাবার পরপরই তার প্রয়োজনীয় সব কিছু মঈন চাচা কিনে দিয়েছে তার জন্যে আলাদা রুম দিয়েছে। বাড়ির সবাই তাকে অত্যন্ত আদর করে। ভর্তি হবার পরের দিনই সে কয়েকদিনের জন্যে গ্রামে আসবে ভাবী আর রুমীকে দেখার জন্যে।

কিন্তু তবুও মনের মধ্যে কিসের যেন এক অব্যক্ত ব্যথা তোলাপাড় করছে। এক আত্মবঞ্চনার তীক্ষ্ণ কাঁটা হৃদয়কে যেন ক্ষত-বিক্ষত করে তুলছে। আজাদকে পাঠিয়ে পর্যন্ত

বিবেকের দংশনে দিনরাত্রি সবসময় শফিক ছটফট করছে। গত কয়েক রাত্রি সে ঘুমুতে পারেনি। কি যেন এক অস্বস্তিতে ঘুম আসে না। পা হারা শফিক পায়চারী করতে পারেনা- নিদ্রাহীন চোখে বিছানায় বসে থাকে। মাঝে মধ্যে নাছিমার ঘুম ভেঙ্গে গেলে স্বামীকে বিছানায় বসে থাকতে দেখে চমকে উঠেছে। সে বলেছে- বসে আছো যে?

ম্লান মুখে শফিক বলেছে- ঘুম আসেনা নাছিমা, ঘুমুতে পারিনা। নাছিমা বোঝে স্বামীর মর্ম যন্ত্রণা, কতটা অসহায় হয়ে যে আজাদকে মঈন চাচার কাছে যাবার অনুমতি সে দিয়েছে তা আর কেউ না বুঝলেও নাছিমা বোঝে। এক সময় যে হাত ছিল দান করতে অভ্যস্থ আজ সে হাত দান গ্রহণ করছে, এ যে তার স্বামীর জন্যে কত বড় আঘাত- তা একমাত্র আল্লাহ তালাই জানে। সে উঠে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে মাথার চুলে হাত বুলাতে থাকে। রাতের নীরবতা ভেঙ্গে মৃদু কণ্ঠে বলে- তুমি নিজেকে অত ছোট ভাবছো কেন ? মঈন চাচাও তো আমাদের কাছ থেকে অনেক নিয়েছে- আর তা ছাড়া আমার আজাদ তো অকর্মা না। সে আয় রোজগার শিখে শোধ করে দেবে। শফিক কোন কথা না বলে পাশ ফিরে শোয়। নাছিমাও বোঝে এ সমস্ত মিথ্যে সান্ত্বনায় তার স্বামীর হৃদয় ক্ষতের রুধির ধারা বন্ধ হবে না।

আজ অশ্রু ভেজা চোখে মলিন মুখে অসময়ে বাড়িতে স্বামীকে আসতে দেখে নাছিমার মন কি যেন এক অজানা আশংকায় চমকে ওঠে। সে রান্না ঘরের দরোজা থেকে এক প্রকার দৌড়েই স্বামীর কাছে এসে বলে- তুমি এত তাড়াতাড়ি এলে যে?

ভালো লাগছে না। বলে শফিক জামার উপরের পকেট থেকে দু'টো চিঠি বের করে স্ত্রীর হাতে দিয়ে শোবার ঘরের দিকে চলে যায়।

নাছিমা রুদ্ধশ্বাসে পত্র দু'টি পড়েই অস্ফুট কণ্ঠে "আলহামদুলিল্লাহ" বলেই ছুটে স্বামীর কাছে গিয়ে দেখে সে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে ঘরের খড়িকাঠের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলে- তুমি অত ভেঙ্গে পড়ছো কেন? আজাদ তো লিখেছেই, সে হাতের কাজ শিখবে। তারপর একটা চাকরি নিয়ে ওখান থেকে চলে যাবে। তখন নিজের খরচেই পড়বে- পারলে বাড়িতেও কিছু কিছু পাঠাবে। আর মঈন চাচা তো ওকে আদরের সাথেই গ্রহণ করেছে। তুমি অত চিন্তা করো না, এখন উঠো যাও গোছল সেরে নাও। আমি পানি তুলে দিচ্ছি।

রুমী কোথায় নাছিমা?

তোমার ছেলে মাছ ধরে ধরে জমা করছে, বলে ছোট চাচা আসলে খাবে।

ও আচ্ছা। বলে শফিক উঠে যায়।

আট

সালমার বড় ভাই আর মেঝ ভাই ফাহাদ-শাহেদ বাড়িতে আসতেই সালমা উৎফুল্ল হয়ে বলে – জানো ভাইয়া, শেখ পাড়া থেকে আসাদ চাচার ছোট ছেলে আজাদ ভাইয়া এসেছে। ও এখানে থেকে লেখাপড়া করবে। আব্বা বলেছে তুমিই আমাকে আর আজাদ ভাইয়াকে ঢাকা কলেজে ভর্তি করে দেবে।

ফাহাদ-শাহেদ যেন একটু আশ্চর্যই হয়ে যায় বোনের এই পরিবর্তন দেখে। কারণ অন্যান্য বার তারা বিদেশ থেকে এলে আমার জন্যে কি এনেছো, বা আমি যা বলেছিলাম তা আনোনি কেন? তোমরা আসলে আমার কথা ভুলেই যাও বিদেশ গেলে। তোতা পাখির মত কথা বলে সালমা দু' ভাইকে অস্থির করে তুলতো। আর আজ কোন কিছুর কথা জিজ্ঞাসা না করে আজাদের কথা বলাতে ওরা যেন একটু আশ্চর্য হয়েই বোনের দিকে তাকায়। অনেক বারই তারা সালমার জন্যে বহু কিছু এনে বলেছে– তোর জন্যে মার্কেটিং করতে একদম ভুলে গেছি! যা ব্যস্ত ছিলাম।

সালমা হয়ত ছোট শিশুর মতই হাত পা ছুঁড়েছে বা ওর রুমে গিয়ে দরোজা বন্ধ করে বিছানায় মুখ গুঁজে পড়ে থেকেছে। বোনকে নিয়ে ভাইদের এ ধরনের রসিকতা দেখে মঈন চৌধুরী ও তার স্ত্রী তৃপ্তির হাসি হেসেছেন। ভাবীরা স্বামীদের বলেছে– কেন ওকে তোমরা বিরক্ত করো, যা এনেছো শিগ্‌গির দিয়ে দাও।

সালমা যেন সবার নয়নের মণি। ওকে একদন্ড চোখের আড়াল করতে ভায়েরা নারাজ। বড় আপা বলেছিল – সালমা এস. এস. সি পাশ করলে আমেরিকা নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দেব।

ভায়েরা বড় আপাকে বলেছে এ বাড়ির আনন্দটুকু নিয়ে যাবে আপা! ও চলে গেলে এ বাড়ি অন্ধকার হয়ে যাবে যে। তার চেয়ে আমাদের চোখের সামনেই থাক। এখনো ভায়েরা সালমার জন্যে নানা ধরনের খেলনা নিয়ে আসে। কোন কিছু না চাইতেই সালমার জন্যে বিদেশে মার্কেটিং হয়। এবার অনেক কিছুর সাথে বড়ভাই একটা বড় খেলনা হেলিকপ্টার দিয়ে বলে এই নে পাগলী, এটায় চড়ে এবার থেকে ঘুরবি।

সালমা হেসে বলে – তোমার ছেলে বড় না হলে ড্রাইভিং করবে কে? মেঝভাই বড় পুতুল বের করে বলেছে এই যে ছিচ্‌কাঁদুনে – ধর দেখি।

হাসিতে ফেটে পড়ে সালমা বলে– আচ্ছা ভাইয়া, তোমরা কি আমাকে বড় হতে দিবে না ?

কেন, তোকে কি খাঁচায় পুরে রেখে আমি ছোট করে রেখেছি নাকি ?

তাই তো মনে হচ্ছে–নইলে আমার জন্যে পুতুল আনবে কেন– এটা নিয়ে খেলার বয়স কি আমার আছে। তুলে রাখলাম, কয়দিন পরে তোমার বাচ্চা হলে খেলবে।

মনে হচ্ছে বুড়িয়ে গেছিস– তুই যত বড়ই হোস, আমাদের কাছে ছোটই থাকবি। ভাইয়ার কথা শুনে সালমা মেঝ ভায়ের কানে চিমটি দেয়। উহ্‌ করে চেঁচিয়ে উঠে মেঝভাই বলে– বাঁদর কোথাকার।

এই ভাইয়া– সালমা ডাক দেয়।

আবার কি বলবি ?

লেজকাটা।

কি লেজকাটা?

ওই যে তুমি বললে– বাঁদর। আমার তো লেজ নেই। বলেই দু' ভাই বোন হেসে গড়িয়ে পড়ে।

কই আজাদ কই– এদিকে ডাক দে। ভায়েরা বলে।ডাক দিতে হয় না আজাদকে। সে নিজেই তার রুম থেকে ফাহাদ-শাহেদের কণ্ঠ শুনে বের হয়ে আসে। সবাইকে ছালাম দিয়ে স্বলজ্জ ভঙ্গীতে দাঁড়ায়।

সস্নেহে ফাহাদ আজাদকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলে– এতদিনে ভাইদের কথা মনে পড়লো আজাদ ?

সালমা বলে ওঠে– ওকে কেন বলছো ভাইয়া? তোমাদেরই দায়িত্ব ছিল শেখপাড়া গিয়ে ওদের খবর নেওয়া। এতদিন খবর নাওনি এখন অনুতাপ করো।

শাহেদ বলে– ভুল মানুষেরই হয়। আমরা কর্মব্যস্ত মানুষ কখন কোন দিকে যেতে হয় তার ঠিক নেই। কখন গ্রামে যাবো? এসেতো খুব ভালো হয়েছে। আজ থেকে তুমিও আমাদের একটি ভাই। বলেই আবার ফাহাদের দিকে তাকিয়ে বলে– ভাইয়া তুমি কি বলো?

হ্যাঁ হ্যাঁ তুই ঠিকই বলেছিস। আমি কালই আজাদ আর সালমাকে ভর্তি করে দেব।

আজাদ ভাইয়ার কিন্তু লেখালেখি করার আর গান গাইবার অভ্যাস আছে ভাইয়া। সালমা বলে।

তাই নাকি ? তাহলে তো তুই একজন সঙ্গী পেলি ফাহাদ বলে ওঠে।

শাহেদ বলে– ঠিক আছে, একদিন তোমার গান শোনা যাবে।

একদিন কি– আজই আমি সন্ধ্যার পর ওর গান শুনবো। সালমা বলে।

ফাহাদ শাহেদের ব্যবহারে আজাদ মুগ্ধ হয়ে যায়। সে শ্রদ্ধায় মুখের ভাষা হারিয়ে ফেলে। ভাবে এদের ঋণ কিভাবে পরিশোধ করা যাবে। অর্থে এর কোন মূল্য নেই– সে এমন কিছু করে যাবে, যাতে এরা সবাই মানুষের হৃদয়ে চির জাগরুক থাকে। রাতে খাওয়ার পরে সালমা বলে– আজাদ ভাইয়া, চলো নীচে বাগানে যাই।

বাগানে রাতে যেতে নেই সালমা।

কেন–?

কত রকম পোকা মাকড় আছে কে জানে।

চলো চলো, কিছু হবেনা।

সালমার অনুরোধ আজাদ এড়াতে পারে না। বাগানে গিয়ে বসে। সালমাও বেশ একটু ব্যবধান রেখেই বসে বলে– এবার একটা গান গাও। বলেই সে উঠে যেতে লাগে।

আজাদ বলে– আমাকে গাইতে বলে চলে যাচ্ছো যে?

এক মিনিট– আমি গিটার নিয়ে আসি।

না, না, আমি বাজনা ছাড়াই গান গাই–

সে–কি! আশ্চর্য হয়ে যায় সালমা।

হাঁ, আমি বাজনা ছাড়াই গান গাওয়ার সাধনা করেছি সালমা।

কেমন যেন একটু জড়তা নিয়েই সালমা বসে বলে– ঠিক আছে, বাজনা ছাড়াই গাও।

আজাদ গলা পরিষ্কার করে গাইতে থাকে।

কি যে শোকর, আদায় করি এলাহি তোমার
কত যে সুষমায় ভরেছো– ভরেছো আমার চারিধার
কি যে শোকর, আদায় করি এলাহি তোমার।
সারাটা জীবন যদি জপি তবো নাম
তবুও হবেনা এতটুকু গুণ গান।

আজাদ হৃদয়ের সুষমা ঢেলে অন্তরের মাধুরী মিশিয়ে দরদ দিয়ে গায়। কয়েক বার সে একই গানের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। গানের সুর ক্রমশঃ চাঁদের আলোয় আলোকিত উদ্যানকে আচ্ছন্ন করে তার উত্তাল তরঙ্গ যেন গোটা বাড়িটার আনাচে কানাচে আছড়ে পড়ে। বাড়ির প্রতিটি প্রাণী আজাদের গানের বেহশ্‌তী সুরের মূর্ছনায় যন্ত্রচালিতের মত পায়ে পায়ে ফুল বাগানে এসে তন্ময় হয়ে অপলক নেত্রে আজাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। স্রষ্টার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অপারগ সৃষ্টি কি যেন এক মর্মব্যথায় গানের মধ্যে দিয়ে রাজাধিরাজ মহান রব্বুল আলামিনের কুদরতির পদপ্রান্তে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করছে। অনন্ত–প্রাণের আকুল ব্যথাতুর করুণ প্রার্থী আত্মা যেন আর্ত হাহাকারে পাপ মোচনের জন্যে মূর্ছিত হয়ে পড়ছে আল্লাহর দরবারে। আর সে মর্মবেদনা ভরা ফাগুনে আগুন ঝরিয়ে সপ্ত আসমান ভেদ করে আল্লাহর আরশের কাছে মাথা ঠুকছে– হে আল্লাহ, তোমার শোকর জানাবার ভাষা আমার নেই।

গোটা পরিবেশ যেন নিস্তব্দ নিঝুম হয়ে পড়েছে। গান থেমে গেছে অনেক আগেই। কিন্তু তার রেশ যেন দ্যুতি হয়ে ফুল বাগানের ফুলের পাঁপড়িতে গুঞ্জন হয়ে ভাসছে। সালমা পাথরের মূর্তির মত বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে আছে দু'গন্ডে অশ্রু প্লাবিত ধ্যানমগ্ন আজাদের বেহশ্‌তী আলো মন্ডিত মুখমন্ডলের দিকে। মানুষ গাইতে গাইতে যে এমন ভাবে কাঁদে এমন জন্নাতি আবেশের মোহময় পরিবেশের সৃষ্টি করতে পারে, সে আগে কখনো দেখেনি।

মঈন চাচা ও তার দু'ছেলে ফাহাদ–শাহেদ এসে আজাদকে জড়িয়ে ধরে। মঈন চাচা দোয়া করেন– আল্লাহ তোমাকে আরো গাইবার শক্তি দিন। শাহেদ বলে– এত দিন জানতাম বাজনা ছাড়া গান হয়না, কিন্তু তুমি আজ আমার ভুল ভেঙ্গে দিলে আজাদ। ফাহাদ বলে– এমন রত্ন গ্রামে পড়েছিল, আমি তোমার গান রেকর্ড করে বাজারে ছাড়বো। তথাকথিত বাজনাওয়ালারা জানুক যে বাজনা ছাড়াও শুধু গলা দিয়েই মানুষের মরমে পৌঁছানো যায়।

নয়

এরপর থেকে চলতে থাকে প্রতিদিন রাতে আজাদের গান। অনেকে ধরে আধুনিক গান গাইবার জন্যে। আজাদ বলে– স্রষ্টার মহিমা নতুন ভাবে যখন দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, আর তা নিয়েই আল্লাহ প্রেমিকরা নিত্য নতুন গান-রচনা করেছে। সুতরাং এর চেয়ে আধুনিক গান আর কি হতে পারে। অব্যর্থ যুক্তি– সবাই নীরব হয়ে যায়। কলেজে ভর্তি হওয়ার পরে শাহেদকে নিয়ে আজাদ বাড়ি থেকে ঘুরে আসে। কম্পিউটার শিখে সে। তার লেখা অনেকগুলো গল্প প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ হয়। মাঝে মধ্যে কবিতাও প্রকাশ হয়। দিন মাস কালের পরিক্রমায় কোথা দিয়ে যেন সময় অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। আজাদ ও সালমা এইচ. এস. সি পরীক্ষা দেয়। উভয়েই স্টার পায়। আজাদের পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ে। সালমা ও আজাদ পরস্পরের পূত ও পবিত্র অবয়ব হৃদয়ে স্থাপন করে। কিন্তু কেউ কাউকে কোন দিন বলেনা– বলতে পারে না– আমি তোমার, শুধু তোমারই। সালমার ছোট ভাই শাকিলও ইতিমধ্যে ইংল্যান্ডে লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে এক বিদেশী মেমকে বিয়ে করে বাড়িতে আসে। প্রতিদিন বিকেলে এখন এ বাড়ির সামনে ফাহাদ–শাহেদ ও শাকিলের বন্ধুরা নানা ধরনের খেলার আসর বসায়। মাঝে মধ্যে সালমা ও সালমার বান্ধবীরাও যোগ দেয় খেলায়।

শাকিলের বন্ধুরা যতটা খেলার আকর্ষণে না আসে এ বাড়িতে তার চেয়ে বেশি আকর্ষণ যেন ঐ সালমা। সালমার হৃদয় জয় করার জন্যে ওদের মধ্যে যেন প্রতিযোগীতা চলে। কিন্তু আজাদ, সে যেন সব কিছু স্বযত্নে এড়িয়ে নিজের লেখাপড়া, কম্পিউটার, টেলেক্স, আর গান নিয়ে ব্যস্ত। নিজের আদর্শে সে অটল। আল্লাহর দেয়া বিধান প্রতিকূল পরিবেশে যথা সম্ভব নিজে মেনে চলে এবং বাড়ির সবাইকে মেনে চলার জন্যে আহ্বান জানায়। সালমাকে সে কোরান পড়া শিখিয়েছে– নামাজের যাবতীয় নিয়ম–কানুন, দোয়া কালাম শিখিয়েছে।

একদিন নাস্তার টেবিলে আজাদ মঈন চাচাকে উদ্দেশ্য করে বলে– আমাকে একটা চাকরি জুটিয়ে দিলে ভালো হয়।

চাচা বলেছে– আগে শিক্ষা জীবন শেষ করো তারপর চাকরির চিন্তা পরে করবে।

কিন্তু সে জানে তার ভাইয়া এই পরের খরচে লেখাপড়া করা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। বাড়ি গেলেই ভাইয়া নিজের পায়ে দাড়িয়ে লেখা পড়া করার তাগিদ দেয়। প্রায় চিঠিতেই সেই কথা লেখে। চিঠিগুলো সালমার চোখেও পড়ে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে সে এ পর্যন্ত কোন কথা আজাদের সাথে বলেনি।

একদিন দুপুরে খাওয়ার পরে আজাদ তার নিজের রুমে বসে একটি গল্প লিখছিল। হঠাৎ শাকিল এসে রুমে প্রবেশ করে বলে– আজাদ, আজ বিকেলে আমার এক বন্ধু আসবে। ওর নাম জাফর। ওর অফিসে একজন পার্ট টাইম লোক নিবে। আমি তোমার কথা বলেছি, তুমি বিকালে বাসায় থেকো। তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো।

বিকেলে চায়ের টেবিলে শাকিল ওর বন্ধু জাফরের সাথে আজাদের পরিচয় করে দেয়। সালমা চা পরিবেশন করে। জাফর আজাদকে লক্ষ্য করে চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলে– আগামীকাল আমার অফিসে এসো একটা কাজে লাগিয়ে দেবো। চাকরির কথা শুনে আজাদের চোখ মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সালমা চা ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞেস করে – কি কাজ জাফর ভাই?

যখন যা হয় করবে – জাফর উত্তর দেয় বেশ গম্ভীর ভাবেই।

সালমা বলে– আপনার সুট কোট ইস্ত্রী করার মত শিল্প জ্ঞান আজাদ ভাইয়ার নেই– ও যেতে পারবে না।

বিস্ময়ে জাফর বলে ওঠে– সে-কি সালমা! সুট কোট ইস্ত্রী করার কথা আসছে কেন?

আপনি যে বললেন, যখন যা হয় তাই করতে হবে। এর মধ্যে তো জুতো পালিশ থেকে শুরু করে সুট, কোট ইস্ত্রী পর্যন্তও পড়ে।

না, না সে কথা না। আমার ওখানে নিজের অফিস মনে করেই ও থাকবে।

আমার জানা মতে এই ঢাকা শহরে মঈন চৌধুরীর বাড়ি ছাড়া নিজের মনে করার মত কোন জায়গা আজাদ ভাইয়ার নেই। এ বাড়িকেই নিজের মনে করার জন্যে যথেষ্ট। আজাদ ভাইয়া, তুমি বলে দাও আমি তোমাকে যেতে দিব না। এখন তাড়াতাড়ি হলরুমে গিয়ে সব ঠিক ঠাক করে ফেলো। আমন্ত্রিত অতিথিরা আসার সময় হয়ে গেছে। বলেই সালমা চায়ের কেটলী হাতে নিয়ে তার আম্মার রুমে প্রবেশ করে।

ঘটনার আকস্মিকতায় উপস্থিত সবাই কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে পড়ে। আজাদ যেন লজ্জায় এতটুকু হয়ে যায়। পরিবেশকে হালকা করার জন্যে শাকিল বলে ওঠে–ওর এই খোঁচা দিয়ে কথা বলার অভ্যাস আর গেল না। তুই কিছু মনে করিসনি জাফর।

না না, আমি কি মনে করবো আবার। ওর কথা বলার ষ্টাইল তো আমি ভালোই জানি। আচ্ছা এবার চল খেলতে যাই, ওরা সব অপেক্ষা করছে।

সালমা আজকে দেশের প্রখ্যাত কবি সাহিত্যিককে সাহিত্য পরিষদে গিয়ে দাওয়াত করেছিল বিকালে তাদের বাড়িতে এসে চা পান করার জন্যে। উদ্দেশ্য সবার সাথে আজাদকে পরিচয় করে দেওয়া। একে একে সবাই আসতে থাকে। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম

দিকপাল কবি আল মাহমুদ সাহিত্য বিশারদও আসেন। সালমার অনুরোধে স্বয়ং মঈন চৌধুরী গেটে দাঁড়িয়ে সবাইকে অভ্যর্থনা জানায়। চা বিস্কুটের প্রথম পর্ব শেষ হওয়ার পর "বর্তমান সাহিত্যে গণ মানুষের জীবনধারা" বিষয়ে আলোচনা শুরু হবে।

তার পূর্বে কবি জাহিদ বলে ওঠেন– আলোচনার পূর্বে আমাদের উদিয় মান সাহিত্যিক ও তরুণ কবি আজাদ যদি একটি গান পরিবেশন করেন তাহলে আসর একটু ভালো জমবে।

আসরের প্রধান অতিথি কবি আল মাহমুদ কবি জাহিদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন– আপনি আজাদকে চিনেন নাকি? আমি অবশ্য ওর লেখা বিভিন্ন পত্রিকায় পড়েছি আর মনে করেছি যার লেখায় প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায়, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আদর্শের প্রতিফলন ঘটে তাকে দেখতে। আজ আমার কন্যাসম সালমার উপলক্ষে তাকে দেখতে পেয়ে মনটা খুশিতে ভরে গেছে। কিন্তু ও যে গানও জানে তা তো জানতাম না। গাও বাবা– গাও, শুনি। প্রশংসা শুনে আজাদ যেন লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে যায়। দেশের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল তাকে গান গাইবার জন্যে অনুরোধ করছে এ কম সৌভাগ্যের কথা নয়। সে মনে মনে আল্লাহর শুকরিয়া জানিয়ে গান গাইতে থাকে –

যে ব্যথায় শুধু তুমি, যে ব্যথা প্রাণে মম,
মৃগ কস্তুরি ওগো পরশ মনি সম।
সে ব্যথার স্নিগ্ধ আলো দেয় যে আঁধার সরায়ে
পূর্নিমার আলোয় হৃদয় দেয় যে আলোয় ভরায়ে।
সে ব্যথায় পুড়েই যে হয়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম
মৃগ কস্তুরি ওগো পরশ মনি সম।
সে ব্যথার প্রশান্তি হায় নূরে মোজাস্সাম
সে ব্যথার সুখের বাসর হরে মোকাররম।
সে ব্যথার মায়াবী আলো চাঁদেরও নয়, সূর্যেরও নয়।
সে হাজার কোটি প্রদীপ জ্বালায়, নিজে অমর অক্ষয়।

শ্রাবণের ক্রন্দসী আকাশের মত অশ্রুর ধারায় আজাদের দু' নয়ন থেকে পানি ঝরছে। নীচের লনে সালমার ভাই এবং তাদের বন্ধু–বান্ধবীরা যারা খেলছিল গানের সুর তাদের কানে যেতেই খেলা ছেড়ে সবাই সাহিত্যের আসরে এসে ভীড় জমায়। অবাক বিস্ময়ে তারা আজাদের কণ্ঠে গান শুনতে থাকে। কি অপূর্ব কণ্ঠ! গোটা প্রকৃতি যেন নিশ্চল হয়ে আজাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়েছে। গান শেষ হবার সাথে সাথে সাহিত্য আসরের প্রধান অতিথি কবি আল মাহমুদ সাহেব স্বয়ং উঠে এসে আজাদকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন– যদিও তুমি আমার সন্তানের মত কিন্তু এ গানের জগতে তুমি আমার শ্রদ্ধেয়, তোমার এ প্রতিভাকে কলিতে আবদ্ধ না রেখে দিক দিগন্তে ছড়িয়ে দাও। গানের নামে অশ্লীলতার আবর্তে জাতির যুবক–তরুণেরা আজ খাবি খাচ্ছে। তোমার গান তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিবে।

আজাদ বলে– আপনি আল্লাহর কাছে আমার জন্যে দোয়া করবেন, আমি যেন অন্ধকারে আলো জ্বালাতে পারি।

ইনশাল্লাহ তুমি পারবে। বলে কবি আল মাহমুদ সাহেব আজাদের পিঠ চাপড়ে দেন।

এবার শুরু হয় পরিচয়ের পালা, পরিচয় পর্ব শেষ হতেই প্রধান অতিথি বললেন– আমি ব্যক্তিগত ভাবে আজাদকে অনুরোধ করছি, আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করতে। আজকে ও একমাত্র বক্তা আর আমরা সবাই শ্রোতা।

আজাদ গ্রামে থাকতে স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এবং মসজিদে বক্তৃতা করতো। ঢাকাতেও কলেজে অনেক বারই বক্তৃতা করেছে। সবার প্রশংসা পেয়েছে। প্রধান অতিথির অনুরোধে সে আল্লাহর শুকরিয়া জানিয়ে, রাসূল (দঃ) এর উপরে দরুদ পড়ে সবাইকে ছালাম জানিয়ে বক্তৃতা শুরু করে–

আমাদের বর্তমান অধিকাংশ সাহিত্যই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের চিন্তা চেতনা বহন করেনা। ভিন দেশের আদর্শ সভ্যতা সংস্কৃতি আমাদের সামনে উপস্থাপন করে আমাদের সাহিত্য। বর্তমান তরুণ সমাজ জানতেই পারছেনা যে আমরা একটি ঐতিহ্যবাহী জাতি। আমাদের তরুণ–যুবকেরা জানতে পারছে না পাশ্চাত্য সমাজ এক সময় আমাদের কাছে থেকে সব কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেছে। বর্তমান অধিকাংশ সাহিত্যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রাণের স্পন্দন খুঁজে পাওয়া যায় না। এ দেশের অধিকাংশ কবি সাহিত্যিকগণ যেন তাদের কলম ভিন দেশের কাছে বন্ধক দিয়েছে।

আজাদের বক্তৃতা শুনে সবাই তুমুল করতালিতে হলরুম মুখরিত করে তোলে। সালমার বন্ধু–বান্ধবীরা ও তার ভাইয়াদের বন্ধু–বান্ধবীরা পরিচিত হওয়ার জন্যে আজাদের কাছে আসে। সে সবার সাথে ছালাম বিনিময় করে।

অনুষ্ঠান শেষে সালমার বান্ধবী তারানা বলে– কি রে সালমা, এ গোলাপকে তুই শোকেসে এতদিন বন্ধ করে রেখেছিলি কেন?

ওকে ফুলদানীতে মানায় না যে– তাই।

তাহলে ফুল বাগানে রাখতিস।

ওরে বাবা– তাহলে তো ভ্রমর গুণ গুণিয়ে আসতো।

ভ্রমর আসতো না ছাই– বল সূর্য কিরণে ঝরে যেতো।

হতভাগী যা জানিসনা তা নিয়ে কথা বলিস না। ও সূর্য কিরণে ঝরে না– সূর্য কিরণ থেকে জীবনী শক্তি সঞ্চয় করে।

তাহলে ধরে খাঁচায় আটকিয়ে ফেল না।

ওকে ধরার মত খাঁচা আমার নেই, তা তোদের এত আগ্রহ কেন? সখ থাকলে কাছে গিয়ে দেখ পুড়ে যাবি।

বাবা, ঐ পাড়া গায়ের এক কবির এতই উত্তাপ! তুই বোধ হয় পুড়েছিস!

মাঝে মাঝে পুড়তে ইচ্ছে জাগে কিন্তু উপযুক্ত সময় এখনো আসেনি। আচ্ছা, আমি একটু বাইরে বের হবো। পরে কথা হবে।

সঙ্গে ঐ গোলাপটি থাকছে তো?

তোরা যে কি বলিস– বলেই সালমা চলে যায়।

দশ

গভীর রাত। বাড়ির সবাই ঘুমে অচেতন, আজাদের চোখে ঘুম নেই। বিছানায় এপাশ ওপাশ করছে সে। মনের গহিনে কোন কথা লুকিয়ে থাকলে কি মানুষ এমনই অস্বস্থিতে ভুগে? সে কি বলবে সামনা–সামনি সালমাকে– প্রথম যে দিন আমি তোমাকে দেখেছি সেদিন থেকেই আমি তোমাকে ভালোবাসি। সালমার আচরণে কতদিন মনে হয়েছে এই বুঝি সালমা বললো– আজাদ আমি তোমার, তোমাকে আমি ভালোবাসি। আজ প্রায় দীর্ঘ দু'বছর হতে চললো এ বাড়িতে আসা। সে কতদিন সালমার সাথে বেড়াতে গিয়েছে, খেয়েছে, কলেজে গিয়েছে, ঘন্টার পর ঘন্টা নীরবে নিভৃতে বসে দিনে রাতে গল্প করেছে। জৈবিক কামনায় আজাদ অস্থির হয়ে পড়েছে। মাঝে মধ্যে অনিচ্ছাকৃত ভাবে যখন সালমার হাত তার শরীর স্পর্শ করেছে, তখন তার মধ্যে সুপ্ত ক্ষুধিত যৌবন কোন এক গভীর তৃপ্তির সাগরে ডুবে যাবার জন্যে উম্মাদ হয়ে উঠেছে। মনে হয়েছে যেন এই মুহূর্তে সে নরমাংশাসী অনাহার ক্লিষ্ট বুভুক্ষ ব্যঘ্রের মত সালমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কোন কোন দিন ও এত নিবিড় ভাবে আজাদের কাছাকাছি এসেছে যে, ওর আবেদনময়ী তপ্ত নিঃশ্বাস আজাদের দেহমনে কামনার সর্বগ্রাসী আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। বড় সাধ জেগেছে সালমার দীর্ঘ কালো চুলগুলো একটু নেড়ে দেয়। গোলাপের মত পাতলা অধরে ওর প্রেমচিহ্ন এঁকে দেয়। রক্তিম গন্ডদ্বয়ে ওর গাল রাখে। প্রেমের সঞ্জীবনী সুধায় পরিপূর্ণ পেলব বুকে মাথা রেখে সুখের সাগরে হারিয়ে যায়।

কিন্তু আজাদ তার সমস্ত অবৈধ ইচ্ছাকে টুটি টিপে হত্যা করেছে আল্লাহর ভয়ে। মনে এ জাতির কল্পনা আসার পর পরই সে তওবা করেছে– নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে আল্লাহর সাহায্য কামনা করেছে নামাজের মাধ্যমে। সে প্রতিজ্ঞা করেছে, বিয়ের পূর্বে সে কোন নারীর সংস্পর্শে যাবে না। নারীর সংস্পর্শে সে না–ই বা গেল। কিন্তু সালমাকে তো সে অস্বীকার করতে পারে না। সে তো ওকেই মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। নিজের ভবিষ্যৎ স্ত্রী হিসেবে কল্পনা করে। সালমা তাকে স্পষ্ট ভাবে কিছু না বলার কারণ কি? ওর এতদিনের ব্যবহার কি প্রমাণ করে? ওর প্রতিটি আচরণ বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে তো আজাদের ছবিই স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। না–কি সালমা অন্য কারো প্রতি তার আসার পূর্ব থেকেই গোপনে প্রেমাবদ্ধ, বাগদত্তা হয়ে আছে? নাহ্, তা–ই বা কি করে সম্ভব! এ ধরনের কোন আভাষ ইঙ্গিত তো এই দুই বছরে সালমার কাছে থেকে আজাদ পায়নি। ওর আচার ব্যবহারেও তো কিছু ধরা

পড়েনি। বরঞ্চ ওকে দেখা গেছে সব যুবকদের এড়িয়ে চলতে আর আজাদের প্রতিই বেশি ঝুঁকে পড়তে। তাহলে সে ভুল দেখেনি তো! সালমা কি তাকে এখনো ভালোবাসেনি?

না না, এ হতে পারে না। সালমার প্রেম শুধু তার চোখে নয়, গোটা মুখে প্রকাশ পেয়েছে। আজাদ ভুল দেখেনি। এত বড় ভুল আজাদ করতে পারে না। সালমা ছেলে মানুষ নয়। তবুও সে বলছে না কেন, আজাদ আমার জীবনে মরণে তুমি শুধুই তুমি।

প্রশ্নটা আজাদের বুকের মধ্যে ব্যথার বীনাতে আজ এই গভীর রাতে ঝংকার তোলে। সে ঘুমুতে পারে না। শয্যা ছেড়ে জানালার কাছে আসে। নীচে বাগানের দিকে তাকায়। চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় বাগানের সদ্য ফোটা ফুলগুলোকে মনে হয় যেন নব বধূ অপরূপ সাজে সজ্জিতা হয়ে বাসর ঘরে ঘোমটা টেনে তার প্রিয়তমের আগমনের অপেক্ষা করছে। আবার সে ভাবে, কতদিন সে দেখেছে সালমার উজ্জ্বল ফর্সা দেহে আজাদের প্রেমের বিজয় পতাকা সগৌরবে উড়ছে। ওর হৃদয় আকাশে সেই এক মাত্র নক্ষত্র হয়ে উদিত হয়েছে। সালমার ফাগুন রাঙা যৌবনে আজাদ তার বিজয় বাতাস বইতে দেখেছে। তাহলে সে কি সালমাকে সব কথা জানাবে? সে কি বলবে সালমা, তুমিই আমার প্রেমের পবিত্র অঙ্গনে প্রেমের পুষ্প কাননে প্রথম ফোটা ফুল! ভালোবাসার স্নিগ্ধ জলাশয়ে প্রথম বলাকা! প্রেমের ঋতুতে তুমিই ফাগুন! জীবনের যাতনায় তুমিই সুখের বাসর!

নাহ্! সে বলতে পারবেনা। তার আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে ইসলামী মূল্যবোধকে পদদলিত করে ঐ উগ্র আধুনিকতাবাদী, পাশ্চাত্যের নগ্ন সভ্যতার অনুসারীকে বলতে পারবেনা যে আমি তোমাকে ভালোবাসি। সে এ জীবনে সালমাকে নাই বা পেলো। কিন্তু তার প্রেম কি ব্যর্থ হবে? না, সে তার প্রেমকে ব্যর্থ হতে দিবেনা। তার একনিষ্ট প্রেম দিয়ে সালমাকে ইসলামী আদর্শের প্রতি আনুগত্যশীল করবেই। আর যদি না-ই সে পারে তাহলে বিলাশের কেলিকুঞ্জে সে প্রেম সার্থক না হোক বিরহের অগ্নিকুন্ডে তাকে গ্রহণ করতেই হবে। নিস্তব্দ নিঝুম নিশিতে আজাদের চোখের ঘন পল্লে অশ্রু শিশির বিন্দু রূপে ঝরে পড়লো।

নাহ্! এ সব সে কি ভাবছে। তার মত এক দরিদ্র, অভাবী তদুপরি সে এখানকার আশ্রিত, তার কাছে কেন সালমা আসবে? সে সালমাকে কি দিতে পারবে? বাড়ি ঘর নেই। অর্থ বিত্ত নেই। আছে শুধু সাগরের জোয়ারের মত যৌবন ভরা দেহ। শুধু কি এই কানায় কানায় অমৃত সুধা পূর্ণ গর্বিত অদম্য যৌবনের লোভে সালমার মত ধনীর দুলালী তার গলায় প্রেমমাল্য দান করবে? ওর জন্যে আজাদের চেয়েও শৌর্যে বীর্যে ধনে মানে অনেক অনেকগুণ বেশি যুবক হয়ত প্রেমের বাসর সাজিয়ে অপেক্ষা করছে। আর তার মত এক দরিদ্র অভাগার সাথে মঈন চৌধুরীর মত শিল্পপতি মেয়ে দিতে আসবে? এ চিন্তা করাও তো অন্যায়? আল্লাহ, এ সমস্ত চিন্তা তুমি আমার মন থেকে দূর করে দাও। আমি যেন সালমাকে জীবন সাথী হিসেবে পাই তাহলে সে ব্যবস্থাও তুমি করে দাও। আর আমার জীবন সঙ্গীনি হিসেবে অন্য কাউকে যদি তুমি নির্বাচন করে রাখো তাহলে সালমার স্মৃতি তুমি আমার স্মৃতিপট থেকে মুছে দাও।

আজাদ আবার ভাবে সালমা যদি তাকে ভালো না-ই বাসবে তাহলে সে ওর কাছে থেকে ইসলামের বিধি বিধান শেখার জন্যে এত আগ্রহী কেন? কেনই বা ও কোরান পড়া শিখলো? নিজে কোরান কিনে কয়েকবার খতম দিয়ে ওর নিজের কোরান আজাদকে কেন উপহার দিলো? সে প্রশ্ন করেছিল- তোমার নিজের কোরান শরীফটাই দিলে সালমা, নতুন দেখে তো একটা কিনেও দিতে পারতে?

পারতাম কিন্তু ওতে গৌরবের কিছু থাকতো না। আমার নিজের পড়া কোরান তুমি তোমার কণ্ঠ দিয়ে পড়বে এটাই তো আমার গৌরব।

সালমার এই কথার উত্তরে সে চেয়ে থেকেছে কোন জবাব দিতে পারেনি। কিন্তু সালমাকে সে অনেক দিনই বলেছে ইসলামের প্রকৃত অনুসারি হতে। কিন্তু সে তার খেয়াল খুশি মত যখন মন চেয়েছে নামাজ রোজা করেছে আবার করেও নি। যদি সে আজাদকেই ভালোবাসবে তাহলে তো সে তার কথা শুনতো? কিন্তু ওর কোরান শরিফ উপহার দেওয়ার পরের কথাটা! তা-ও কি মিথ্যা?

আজাদ আর ভাবতে পারে না। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা করছে। এ কিসের যন্ত্রণা! না পাওয়ার যন্ত্রণা! ব্যর্থতার যন্ত্রণা! কিভাবে এ যন্ত্রণা থেকে সে মুক্তি পাবে! হ্যাঁ এক জায়গায়- একটি জায়গাই আছে তার হৃদয়ের না বলা কথা বলবার, মনের সমস্ত ব্যথা বেদনা উজাড় করে নিবেদন করার একমাত্র নির্ভরযোগ্য জায়গাতেই সে নিবেদন করবে। ঘড়ির দিকে আজাদ তাকিয়ে দেখে রাত তিনটা পার হয়ে গেছে। আগে সে মাঝে মধ্যে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করতো, অনেক দিন তা বাদ পড়েছে। আজ সে আদায় করবে। তাড়াতাড়ি বাথরুমে প্রবেশ করে অজু করে নামাজে দাঁড়িয়ে যায়। নামাজ শেষে দু'টি হাত আল্লাহর দরবারে তুলে বলতে থাকে-

রাব্বুল আলামিন, সাধ্যমত তোমার নির্দেশ মেনে চলছি তোমার পৃথিবীতে তোমার বিধান প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে গানের মাধ্যমে, লেখা লেখির মাধ্যমে চেষ্টা করছি। তবুও তো আমি মানুষ, আমার ভুল হবে- হচ্ছে। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। তোমার বিধানের প্রতিকূল পরিবেশে বাস করছি আমি। প্রেম-প্রীতি ভালোবাসা জৈবিক তাড়ণার অধিকারী মানুষ। আমি পদে পদে ভুল করছি। রাব্বুল আলামিন, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

হে আল্লাহ, আমি তোমার এক বান্দী সালমাকে ভালোবেসেছি, তুমি যদি এর মধ্যে আমার জন্যে কল্যাণ নিহিত রাখো তাহলে ওকে আমার জীবন সাথী বানিয়ে দাও। আর যদি তুমি এর মধ্যে কল্যাণ না রেখে থাকো তাহলে সালমার প্রতি আমার আকর্ষণ দূর করে দাও। এই যন্ত্রণা আমি সইতে পারছিনা, এ থেকে আমাকে তুমি মুক্তি দাও, আল্লাহ আমাকে তুমি মুক্তি দাও।

আজাদের দুই গন্ড বেয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু নির্গত হচ্ছে। হৃদয়ে পুঞ্জিভূত অব্যক্ত বেদনার ঘনকালো মেঘ শ্রাবণের বারিধারার মত অদম্য বেগে এসে জায়নামাজ ভিজিয়ে দিচ্ছে।

আল্লাহ তোমার দোয়া কবুল করেছেন, এবার দরোজাটা খুলে দাও।

নিস্তব্ধ নিঝুম নিশিতে সালমার কণ্ঠ অশরীরীর কণ্ঠের মতই তরঙ্গ সৃষ্টি করে। আজাদ চমকে কণ্ঠ শব্দের উৎস বারান্দার জানালার দিকে অশ্রু সিক্ত নয়নে তাকিয়ে যেন প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খায়। সে বিষয়ে বিমূঢ়, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। সালমা আবার ফিসফিসিয়ে উঠে–

দরোজাটা একটু খুলো না!

আজাদ সালমাকে দেখতে থাকে। বারান্দার দিকের জানালায় অন্ধকারে সালমার মুখাবয়ব যেন তিমিরাবৃত রজনীতে অরুন্ধতি নক্ষত্রের মতই দেদিপ্যমান। রুমের স্বল্প আলোর ছটায় ওর মুখের উজ্জ্বলতা যেন আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। আজাদ যেন নির্জীব অনড় অচল।

একি! সে তো এভাবে সালমাকে চায়নি। এত গভীর রাতে তার মত এক যুবকের রুমে সালমা প্রবেশ করতে চায়, কিন্তু কেন?

আমি তো তোমারই হয়ে এসেছি– আমাকে গ্রহণ করবে না আজাদ? সালমার কণ্ঠে যেন আবেদন ফুটে উঠে। কেমন যেন মাদকতা পূর্ণ ওর কণ্ঠ।

আজাদ সম্বিত ফিরে পায়। সে তাড়াতাড়ি জায়নামাজ থেকে উঠে চোখ মুছে জানালার কাছে গিয়ে বলে–সালমা, এত রাতে তুমি!

আমি সব শুনেছি, আমি চাইনি আমি তোমার কাছে পরাজিত হই। আজ যখন তুমি আমার কাছে হেরে গেলে তখন তো আমি আর স্থির থাকতে পারি না। এভাবে দাঁড়িয়ে রাখবে না ভিতরে আসতে দিবে?

আজাদ তাড়াতাড়ি গিয়ে দরোজা খুলে বারান্দায় সালমার কাছে গিয়ে বলে– সব কথা পরে হবে সালমা, এখন নিজের রুমে গিয়ে ঘুমাও গে।

কেন আজাদ ভাই, এখন বলতে বাধা কোথায়?

প্লিজ সালমা, এত রাতে কেউ দেখে ফেললে–

অন্য কিছু ভাববে এই তো?

তুমি বুঝনা? আজাদের কণ্ঠ কেঁপে যায়।

এই সাহস নিয়ে তুমি প্রেমের কাঙ্গাল হয়েছো?

প্রেমের কাঙ্গাল হতে হলে সাহসের প্রয়োজন নেই– বিরাট হৃদয়ের প্রয়োজন।

তা তোমার আছে স্বীকার করি, কিন্তু এত ভয় পাচ্ছো কেন তুমি?

ভয় না সালমা,চরিত্রে কোন দাগ পড়ুক এটা তো কাম্য হতে পারে না।

কাঁটার জ্বালা হাতে যদি না–ই সয়, তাহলে গোলাপ তুলতে আসো কেন?

তাই বলে কলংকের বোঝা মাথায় নিব?

প্রেম আর কলংক তো পাশাপাশি অবস্থান করে আজাদ ভাইয়া।

আজাদ নীরবে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। সালমা আবার বলে– নিন্দার কাঁটা যদি গায়ে না বিঁধে তাহলে তো প্রেমের স্বাদ আস্বাদন করা যায় না। তবে তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। আমি এমন কিছু করবো না যাতে তোমার ক্ষতি হয়। আর হ্যাঁ, এখন এতরাতে আমি কেন কিভাবে এলাম পরে বলবো। আচ্ছা আসি– বলেই সালমা দ্রুত পদে নিজের রুমে চলে যায়।

আজাদও নিজের রুমে এসে দরোজা বন্ধ করে বাগানের দিকের জানালার সামনে দাঁড়ায়। এভাবে যে তার হৃদয়ের দরোজা সালমার সামনে খুলে যাবে সে তা কল্পনাও করেনি। তার এতদিনের অহংকার গৌরব আর পৌরুষ যে সালমার পায়ের কাছে মুখ থুবড়ে পড়বে কোনদিন সে স্বপ্নেও দেখেনি। কিন্তু সালমা! ও এতরাতে কেন তার জানালার সামনে দাড়িয়ে ছিল? তাহলে কি সে প্রতি রাতেই চপি চুপি সবার অলক্ষ্যে এসে তাকে দেখতো? অপরাধি তাহলে সে একা নয়– সালমাও। ও যে বলে গেল আজাদ ওর কাছে পরাজিত হলো। মিথ্যে কথা। সে পরাজিত হয়নি। আজ দীর্ঘ দু' বছরেরও বেশি সে এই রুমে অবস্থান করছে। রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সে–ও বারান্দা ঘুরে ঐ পাশের রুমে সালমাকে দেখতে যেতে পারতো। কিন্তু সে যায়নি– সালমাই এসেছে। অতএব সালমাই পরাজিত হয়েছে– সে নয়।

এ ধরনের নানা কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় ফজরের আজান তার কানে আসে। অজু করে নামাজ আদায় করে আজাদ কোরান তেলাওয়াত করতে থাকে।

তেলাওয়াত শেষে মুনাজাত করে কোরানে চুমু দিয়ে সে টেবিলের উপরে কোরান রেখে ইসলামী সাহিত্য নিয়ে বসে। সালমার বড়ভাবী আজাদের রুমে প্রবেশ করে বলে– আজাদ এসো, নাস্তা খাবে। বলেই তিনি চলে যেতে উদ্যত হন।

আজাদ যেন কতকটা আনমনেই বলে ওঠে– সালমা কোথায় ভাবী?

বড়ভাবী আজদের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন– ওর জন্যে ব্যস্ত হবার কারণ নেই। খুব সকালে কি দরকারে যেন বান্ধবীর বাড়িতে গেছে, এক্ষুনি চলে আসবে। বড়ভাবী হাসতে হাসতে চলে যান।

আজাদ যেন হতভম্ব হয়ে যায়। এ সে কি বললো! কেন সে সালমার ব্যাপারে এত আগ্রহ দেখালো? তার কথা শুনে কি কিছু বুঝতে পেরেছে নাকি? নাহ্, সে তো শুধু জানতে চেয়েছে সালমার কথা। প্রতিদিন তো সে–ই তাকে নাস্তার জন্যে ডেকে নিয়ে যায়। হঠাৎ আজ বড় ভাবীকে দেখে সে ওর কথা জানতে চেয়েছে। এর মধ্যে তো হাসির কিছু দেখছে না আজাদ। তাহলে.....।

আজাদ চিন্তিত মনে নাস্তার টেবিলে গিয়ে বসে। পূর্ব থেকেই মঈন চাচা ও চাচী তার জন্যে নাস্তা নিয়ে অপেক্ষা করছেন। নাস্তা খেতে খেতে মঈন চাচা জিজ্ঞাসা করেন– আজাদ তোমার এইচ এস সির রেজাল্ট বোধহয় দুই একদিনের মধ্যেই আউট হবে। তুমি কি কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছো, কোন সাবজেক্ট নিয়ে ভার্সিটিতে ভর্তি হবে?

আজাদ কোনদিনই মঈন চাচার সাথে বেশি কথা বলার সাহস পায়না। যদিও তিনি ওকে নিজ সন্তান জ্ঞানেই দেখেন। মানুষ যাকে বেশি শ্রদ্ধা করে তার সামনে কথা বলতে গেলে অজানা আশংকায় বুক কাঁপে। কখন না জানি কোন বেয়াদবি হয়ে যায়। আজাদেরও যেন সেই অবস্থা। তবুও আজকে সাহস করে বলে– আমি ভাবছি ইতিহাস নিয়ে পড়বো– আর আজাদের গলার কাছে কথা যেন আটকে যায়।

থামলে কেন বাবা বলো। বলেই মঈন চাচা জিজ্ঞাসু নেত্রে আজাদের দিকে তাকায়।

সে মাথা নিচু করে বলে–চাচা, আমি একটা পার্ট টাইম চাকরি খুঁজছি, হয়ত পেয়ে যাবো। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে চাকরি পেলে আমি কোন মেসে চলে যাবো–

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে সালমার আম্মা বলেন–সে কি বাবা! আমরা কি তোমাকে কোন কষ্ট দিয়েছি?

না, না। চাচী, আমি তো আপনার স্নেহের ছায়ায় কত যে সুখে থেকেছি যা কোন দিন ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না।

তাহলে কেন চলে যাবে বাবা? মঈন চাচা জিজ্ঞাসা করেন।

আজাদ বলে– চাচা, আমার ভাইয়া ভাবী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। আপনি অনেক বারই বলেছেন বাড়িতে প্রতি মাসে একহাজার করে টাকা পাঠাতে। কিন্তু চাচা, আমার উপার্জনের একশত টাকা পেলে ভাইয়ার মনে খুশীর যে জোয়ার আসবে তা আপনার পাঠানো এক কোটি টাকা পাঠালেও ....

আসবে না আমি জানি। এ–ও আমি জানি তুমি এখানে আমার খরচে চলছো শফিক তা স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারছেনা। আমিতো তোমার আব্বাকে চিনতাম তিনি যে বিপুল আত্মমর্যাদাশীল মানুষ ছিলেন। আর তারই সন্তান তো তোমরা। ঠিক আছে বাবা, আমি আর তোমাদের আত্মমর্যাদায় আঘাত করতে চাইনা। তবে যেখানেই থাকো, আমার কাছে যেন প্রতিদিন তোমার কুশল সংবাদ আসে। আসলে আমারই ভুল হয়েছে। এতদিন তোমাদের কোন সংবাদ আমি রাখিনি। জানিনা কেয়ামতের মাঠে আসাদ আমাকে ক্ষমা করবে কি–না? শেষের কথাগুলো বলতে যেয়ে কান্নায় যেন মঈন চাচার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। তিনি চোখের পানি আড়াল করার জন্যে তাড়াতাড়ি নাস্তার টেবিল ছেড়ে নিজের রুমের দিকে চলে যান। সালমার আম্মা চোখ মুছতে মুছতে বলেন– যেখানেই যাস বাবা, তোর এই বুড়ী মাকে যেন ভুলে না যাস। ঘটনার আকস্মিকতায় আজাদ যেন হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। এতটা স্নেহের ফল্গুধারা ওর জন্যে এদের হৃদয়ে বইছে! এরা তাকে হৃদয়ের এমন এক স্থানে আসন দিয়েছে যেখানে শুধু আপন সন্তানই আসন পেতে পারে।

কিন্তু যত যাই হোক, এ বাড়ি তাকে ছাড়তেই হবে। এখানে আর তার থাকা চলবে না। গত রাতে যা ঘটেছে এরপর আর এখানে এক মুহূর্তও নয়। তার মন যেন বলছে গতরাতের ঘটনা মহাপ্রলয়ের সূচনা মাত্র। এরপরই সব কিছুর ধস থামবে। মর্যাদার সুউচ্চ আসন থেকে সে ঘৃণা ও লাঞ্ছনার অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবে। চায়ের কাপ হাতে আজাদ পাথরের মূর্তির

মতই নিশ্চল হয়ে বসে থাকে। চা ঠান্ডা বরফ হয়ে গিয়েছে। গতরাতের ঘটনা ঈশান কোণে কাল বৈশাখীর রুদ্র মেঘের মতই হঠাৎ এক প্রলয়ংকরী ঝড়ের তান্ডব লিলায় সাজানো ফুলের বাগান যেন তছনছ করে দিয়ে যাবে। সব আলোটুকু নিভিয়ে দিবে। স্মৃতি শুধু দীপ হয়ে জ্বলতে থাকবে। আর তার উত্তাপে আজাদ সারাটা জীবন–আমৃত্যু জ্বলে পুড়ে অঙ্গার হতে থাকবে। অতএব চলে যাও। নিজ হৃদয়ের মাধুরী–সুষমায় রচিত প্রেমকানন–ভালোবাসার উদ্যান তাকে ত্যাগ করতে হবে। নিষ্ঠুর নিয়তি তাকে কোথায় টেনে নেবে, কে জানে। আজাদ ধীর মন্থর পদক্ষেপে নিজের রুমে প্রবেশ করে জানালার কাছে দাঁড়ায়। নিজের অজান্তেই অস্ফুট স্বরে সে আবৃত্তি করতে থাকে কোন বিরহী কবির কবিতা–

নিয়তি আমার প্রথম নায়িকা তুমি দ্বিতীয়া।
নিয়তির হাতে ভাগ্য আমার তোমায় দিয়েছি হিয়া
নিয়তি আমার প্রথম নায়িকা তুমি দ্বিতীয়া।

কাপুরুষেরা নিয়তির দিকে তাকায় আর বীর পুরুষেরা তাকায় নিজ বাহুর দিকে আজাদ – বলতে বলতে বড় ভাবী ওর রুমে প্রবেশ করে। আজাদ চমকে ফিরে তাকায়। বড় ভাবী আবার বলেন–তুমি যাকে হিয়া দিয়েছো তার দিকটা একবারও ভাবলে না ভাই?

প্রশ্ন বোধক দৃষ্টিতে আজাদ বড়ভাবীর দিকে তাকিয়ে বলে–কি বলছেন ভাবী?

বলবো আবার কি– ঘরে আগুন লেগেছে আর তুমি পালিয়ে যাচ্ছো আজাদ? সকালে ভাবী কেন হেসেছিল– ভাবীর এবারের কথায় আজাদ স্পষ্ট অনুভব করতে পারে। এই মাতৃসম মহিয়সী মহিলার কাছে আর কোন কিছুই গোপন নেই, সব কিছুই তার চোখে ধরা পড়েছে।

আজাদ বলে– পালিয়ে যাচ্ছি না ভাবী, আত্মরক্ষা করছি।

আগুন লাগলে তো পানি ঢেলেই আত্মরক্ষা করতে হয়, তা–ও বুঝি বোঝনা হাঁদারাম? ভাবী হাসতে থাকে।

আজাদ গম্ভির কণ্ঠে বলে– এ আগুন নয় ভাবী, ভূমিকম্প। আর ভূমিকম্প শুরু হলে ঘর ছেড়ে পালানোই উচিত।

আজাদ তুমি চলে যাবে যাও, নিজের পায়ে দাঁড়াও আমিও চাই। কিন্তু সালমার দিকটা ভেবেছো? ওকে আমি এ বাড়িতে এসে মাত্র ছয় বছরের পেয়েছি। নিজের মেয়ের মতই দেখেছি, ওর চোখে পানি দেখলে আমার কোথায় লাগবে ভেবে দেখো। বড় ভাবীর কণ্ঠ যেন ধরে আসে।

আমি ওর চোখের সামনে থেকে সরে গেলেই ও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

সুবাস কিন্তু এখন আর কলিতে আবদ্ধ নেই আজাদ– দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে।

জানি ভাবী, ফুলের সৌরভ এক সময় মহাশূন্যে মিলিয়ে যায়।

তাহলে তুমি কি স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছো এখান থেকে চলে যাবে? বলেই বড়ভাবী করুণ ভাবে ছলো ছলো চোখে আজাদের মুখের দিকে তাকায়।

আজাদ বলে– আমি নিরুপায় ভাবী।

তবুও আমার কথাগুলো ভেবে দেখো বলেই বড়ভাবী আজাদের রুম ছেড়ে চলে যান।

এগার

আজাদ জামা প্যান্ট পরে তার বন্ধু রেজার কাছে মগবাজারে গিয়ে কম্পিউটার বা টেলেক্সে চাকরির কথা বলে। রেজা আজাদের মুখেই তাদের পরিবারের অবস্থা শুনেছিল। আজাদ চাকরির কথা বলতেই রেজা বলে– ঐ তো, আশা কম্পিউটারে বোধহয় একজন অপারেটর নেবে। সে দিন ওয়ারলেস রেলগেট দিয়ে আসার সময় আশা কম্পিউটারের একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়েছিল। আচ্ছা চল গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখি। ঐ মালিকের সাথে আমার পরিচয় আছে। বলেই রেজা আজাদকে নিয়ে আশা কম্পিউটারের মালিকের কাছে গিয়ে বলে লোক নেওয়া না হয়ে থাকলে আজাদকে নিতে পারে। আশা কম্পিউটারের মালিক আওয়াল সাহেব বললেন– না রেজা ভাই, তেমন ভালো অপারেটর পাইনি। তা আপনি যখন বলছেন তাহলে আজাদ ভাইকে আমি কাজ দিয়ে দেখি। যদি ভালো কাজ দেখাতে পারেন তাহলে চাকরি দিতে কোন আপত্তি নেই।

ঠিক আছে আজাদ, তুই তাহলে ঘন্টা খানেক কাজ কর আমি আসছি।

আজাদের কাজে আওয়াল সাহেব মুগ্ধ হয়ে বললেন– আপনি কত বেতন চান?

আজাদ বললো–আমি ছাত্র মানুষ, লেখাপড়া করতে হবে নাইটে, বাড়িতেও কিছু পাঠাতে হবে। আপনিই বিবেচনা করে দিবেন।

আওয়াল সাহেব বললেন– আচ্ছা, আপাততঃ সাড়ে তিন হাজার টাকা দেব। মাস কয়েক পরেই বেতন বাড়াবো। ইতিমধ্যে রেজা এসে পড়ে। আজাদ খুশী হয়ে রেজাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলে– তোর উপরে আল্লাহ্ রহম করুন, বিরাট উপকার করলি ভাই। আওয়াল সাহেব বললেন– তাহলে কালকে থেকে লেগে যান, বসে থেকে আর কি হবে।

আজাদ মসজিদে গিয়ে অজু করে দু'রাকায়াত নফল নামাজ আদায় করে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানায়। আওয়াল সাহেবকে বলাতে তিনিই আজাদের জন্যে মগবাজারে একটি মেস ঠিক করে দেন।

আজাদ বাইরে যাবার কিছুক্ষণ পরেই সালমা বাড়িতে আসে। গুণ গুণ করে গান গাইতে গাইতে সিঁড়ি দিয়ে সে যখন উপরে উঠছে সিঁড়ির মাথাতেই বড় ভাবীর সাথে সালমার দেখা হয়। বড়ভাবী আজাদের এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার সব কথা তাকে বলে।

শুনে সালমা বলে– নদীর স্রোতের সামনে বাঁধ দিয়ে নদী দু'কূল প্লাবিত করে ভাবী। ওকে সাগরের পানে ছুটতে দিতে হয়। ওটাই ওর আসল জায়গা। আজাদ ভাইয়া যেখানে সত্যিকার সেখানেই ওর সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে– ও সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হোক। বলেই সালমা মৃদু হাসি দিয়ে বড়ভাবীকে পাশ কাটিয়ে নিজের রুমে চলে যায়। বড়ভাবী অনুভব করলেন কান্নার অদম্য বেগকে হাসির আড়ালে লুকোবার চেষ্টা করলো সালমা।

কি যেন মনে করে সালমা তাদের অফিসে আজ অনেক দিন পরে গেল। এক সুদর্শনা মহিলা ঘটাঘট টাইপ করছিল। সালমাকে দেখেই বলে– ছোট আপাকে যে আর দেখাই যায় না। খুব ব্যস্ত আছেন বুঝি?

না ব্যস্ত কিসের। আজাদ ভাই এখানে কম্পিউটার শিখে, তুমি ওর সাথে গল্প করো কিনা, তাই তোমাদের গল্পে ব্যাঘাত ঘটাতে আমি আসিনা।

গল্প আজাদ ভাই করেন না। দারুন কাজের লোক তিনি। সব কিছু শিখে ফেলেছেন। বয়সের তুলনায় স্বভাবের দিক দিয়ে যেন বুড়ো। তার মধ্যে কোন রোমান্স নেই।

তুমি মহিলা একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর গাধা– প্রথম শ্রেণীর হলেও পশু মেলায় শোভা পেতে, কেন? মহিলার চোখে মুখে কৌতুকের চিহ্ন।

আজাদ ভাইকে তুমি কি চিনবে। আমাকেই নাকানী চুবানী খেতে হয়। ওর রোমান্স শ্যাম্পু করা এলো চুল, দামী শাড়ি আর রক্ত রাঙা লিপষ্টিকের ধারে কাছেও ঘেষে না। ওর প্রেম হৃদয়ের গভীর তলদেশে ঢেউ তোলে, মনের আধাঁর জগতে প্রদীপ জ্বালায়।

বুঝতে পারলাম না ছোট আপা?

থাকগে ও তোমার না বুঝলেও চলবে। বলেই সে বাড়িতে এসে আজাদের রুমের দিকে যায়। দেখে আজাদ কাপড় বদলাচ্ছে। সালমাকে দেখে আজাদের চোখ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। ও জিজ্ঞেসা করে– কি হলো আজাদ ভাইয়া, আজ্ব এত খুশী যে?

চাকর বনে এলাম সালমা।

মানে?

চাকরি পেয়েছি, বেতন সাড়ে তিন হাজার আপাতত মাস কয়েক পরেই বাড়বে। এখুনি পত্র লিখে ভাইয়াকে এই খুশীর সংবাদটা দিই।

এটা তোমার কাছে খুশীর সংবাদ? এতো তোমার জন্যে আত্মহত্যার শামিল!

না, এটা নিজেকে খুঁজে পাওয়ার তীর্থক্ষেত্র– আত্মাকে বন্দিত্ব মুক্ত করা। আমার সন্ধানে আমাকে যেতে দাও সালমা!

চলে যাবে? সালমার কণ্ঠে যেন রুদ্ধ ক্রন্দন। ওখানে যেন তোমার সমাধি রচিত না হয়– বলেই সালমা চলে যায়।

দুপুরের খাওয়া সেরেই আজাদ তার ভাইয়ার কাছে পত্র লেখে। বিকেলে মইন চাচা ও চাচীকে চাকরি ও চলে যাবার কথা জানায়।

তারা কতকটা অনিচ্ছাকৃত ভাবেই সম্মতি দেন। সন্ধ্যা পার হয়ে রাত্রি হয়ে এলো। সালমার কোন খোঁজ নেই। অন্যদিন এতক্ষণ কয়েকবার বিভিন্ন ছলে আসা হয়ে যেত আজাদের কাছে। আজাদ কেমন যেন অস্বস্তিতে ভোগে। কাল সে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে আর এখন পর্যন্ত সালমা একবারও তার কাছে এলো না। একটা প্রচন্ড অভিমান আজাদের বুকের মধ্যে গুমরে ফিরে। রাতে খেয়ে সে তার রুমে এসে দরোজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ে।

ফজরের নামাজ আদায় করে আজাদ তার সব জিনিষপত্র কাপড়-চোপড় সুটকেসে ভরে। সালমার দেওয়া কোরান শরিফটির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বুকে ঠেকিয়ে চুমু দিয়ে সুটকেসে ভরে। আশ্চর্য! এ পর্যন্ত সালমার দেখা নেই! হলো কি মেয়েটার! কাউকে জিজ্ঞাসা করবে আজাদ লজ্জায় তা-ও পারছেনা। নাস্তার টেবিলে গিয়ে নাস্তা সেরে বাড়ির সবাইকে সালাম জানিয়ে যখন নিচে নামছে তখনো সালমার কোন পাত্তা নেই। আজাদের চলে যাবার সংবাদে কোন দুর্ঘটনা ঘটায়নি তো সালমা! আজাদ কেমন যেন থমকে দাঁড়ায়। নাহ্, সে রকম কিছু হলে এতবড় বাড়িতে হৈ চৈ পড়ে যেতো। পিছন থেকে চাচী বলে ওঠেন- হোচট খেলে বাবা? বাঁধা পেলে? তাহলে একটু দেরী করেই যাও, পথে কোন বিপদ থাকতে পারে ওটা কেটে যাক।

গ্রামের প্রাচীনপন্থী মানুষ শহরে এত বছর বাস করার পরেও কুসংস্কার মন থেকে দূর হয়নি। নীচে হল রুমে নামতেই আজাদ দেখে সালমা নিজ হাতে দু'টো বালিশ, তোষক, কম্বল বিছানার দু'টো চাদর বেডিং আকারে রশি দিয়ে বাঁধছে। অনভ্যস্থ শ্রমে এই সকালেও সালমার ফর্সা মুখ মন্ডলে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। ঘামের বিন্দুগুলো যেন মনে হচ্ছে মুক্তোর দানা। পকেট থেকে সুগন্ধি রুমাল বের করে নিজ হাতে যত্ন করে সালমার মুখের ঘাম মুছে দেওয়ার তীব্র ইচ্ছেকে গলা টিপে হত্যা করলো আজাদ। ওর মুখের দিকে তাকাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। অভিমানের বিহঙ্গ আজাদের মন থেকে মুক্ত আকাশে সাথে সাথে ডানা মেলে দিল। সালমা আজ প্রিন্টের একটা শাড়ি পরেছে। মনে হচ্ছে যেন গৃহস্থ ঘরের বধূ। আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে বললো- তোমার মেসের ঠিকানা দাও, আমাকে তো যেতে হবে।

অবশ্যই যাবে বৈকি। বলেই আজাদ ঠিকানা দিল।

সালমা পূর্ব থেকেই চাকর দিয়ে বেবী ট্যাক্সি আনিয়ে রেখেছে। বেডিংটা একজন চাকর বেবীতে উঠিয়ে দিল। আজাদ সবাইকে ছালাম জানিয়ে বিদায় নিল। বেবী ছুটে চললো মগবাজার ওয়ারলেস রেল গেটের উদ্দেশ্যে।

বার

মগবাজার গ্রীণওয়ের রোডে তিনতলার ছাদে একটি রুম। রুম তো নয় কবুতরের খোপ। দু'দিকে দু'টো জানালা। বাতাস হু হু করে আসছে। যাক বাঁচা গেল ফ্যান লাগবেনা। যা গরম তার উপরে টিনের ছাদ। দরোজাটাও টিনের। দেওয়ালের প্লাস্টার জাগায় জাগায় উঠে গেছে। কুষ্ট রোগীর মত ক্ষত দেয়ালের গায়ে। রুমের মাঝখানে একটি লাইট ঝুলছে। হিটার ব্যবহারেরও ব্যবস্থা আছে। ভাড়া পাঁচ শত টাকা। বাথরুম কিচেন রুম সব দোতালার মেসে। নীচ তলায় সুবর্ণা প্রকাশনী। আজাদ দোতালার মেসেই খাবে। অপছন্দ হলেও এই ধরনের রুমে সে আসার কারণ তার লেখালেখি। সিট ভাড়া করে থাকলে নানা অসুবিধায় কোন কিছু সে লেখতে পারবে না। ছাদের এক কোণায় একটি ছোট তক্তা পড়েছিল। তাই ঝুলিয়ে সালমার দেওয়া কোরান শরীফটি রাখার ব্যবস্থা করে সে। রুমের মেঝে কোন রকম পরিষ্কার করে সে বেডিংটা খোলে। সালমার হাতের স্নিগ্ধ স্পর্শ আছে এই বেডিংয়ে। বেডিংয়ের মধ্যে একটি জায়নামাজও দিয়ে দিয়েছে সালমা।

আশ্চর্য! তিন দিন পার হয়ে গেল, কোথায় সালমা! কেন ও আসেনা? ঠিকানা রাখলো আসবে বলে, নাহ্ ও এখানে আসবে কেন, আজাদের সাথে সালমার কিসের সম্পর্ক? আর ওর মত ধনীর দুলালী তার মত এক অখ্যাত মাত্র সাড়ে তিন হাজার টাকা বেতনের সামান্য কম্পিউটার অপারেটরের কাছে কেন আসবে? কিসের দায় পড়েছে? বেশ একটু অভিমান নিয়েই আজাদ অফিসে যায়। আবার ভাবে, সে-ও তো দায়ী কম না। আজ তিনদিন হলো এসেছে একটা টেলিফোনও তো সে করতে পারতো? নাহ্, বড় লোকদের বাড়িতে ফোন করে কাজ নেই ওরা আজাদকে ভুলে যাক। সে কাজে মগ্ন হয়ে পড়ে। ঠিক বিকাল চারটায় ফোন আসে। আশা কম্পিউটারের মালিক আওয়াল সাহেব ফোন ধরতেই অপর প্রান্ত থেকে সালমার সুরেলা কণ্ঠ ঝংকৃত হয়- আমি আজাদের চাচাত বোন সালমা, ওকে দিন। আজাদ ফোন ধরতেই কড়া হুকুম আসে- পাঁচটায় গাড়ি পাঠাচ্ছি, চলে আসবে। রাতে এখানে খাবে।

ফোন ছেড়ে দিল সালমা। যেন দোর্দন্ড প্রতাপশালী সম্রাজ্ঞীর আদেশ। কিন্তু আজাদের মন টানে না আর ওখানে যেতে। বিগত দু'বছরে অনেক সাহায্য সে অপারগ হয়ে গ্রহণ করেছে; কিন্তু আজ আর কেন। নাহ্, সে তো আজ সাহায্য নিতে যাচ্ছে না। বাড়িতে হয়ত কোন ফাংশান আছে। সে তো গত দু'বছরে দেখেছে। বড় লোকের বাড়ি ফাংশান লেগেই আছে। আজ বার্থ ডে তো কালকে ম্যারেজ ডে, আবার গানের আসর খেলার আসর কত কি। আজাদ মেসে এসে দোতালার বাথরুমে হাত মুখ ধুয়ে ছাদে নিজের রুমে গিয়ে মাথা আঁচড়াতে থাকে। এমন সময় গ্রীণওয়ে রোডের মেসের সামনে দামী কার এসে থামে। গাড়ি থেকে নামলো স্বয়ং সালমা। নেমেই সিঁড়ি দিয়ে তর তর করে দোতালায় উঠতেই সামনে

একজনকে পায়। জিজ্ঞেস করে– আজাদ ভাইয়া কোন রুমে থাকে? ওর পুরা নাম আজাদ নোমানী, কোন রুমে?

যিনি নতুন মেস মেম্বার?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে চেনেন বোধ হয়? না চেনাটা লোকটির জন্যে যেন মহা অন্যায়।

উনি তো ছাদে থাকেন, আপনি দাঁড়ান আমি ডেকে দিচ্ছি।

ছাদে! সালমা চোখ কপালে তুলে বলে– ছাদে কি মানুষ থাকে নাকি?

ছাদে মানে ছাদের রুমে আর কি।

আচ্ছা ডাকতে হবে না, আমিই যাচ্ছি। বলেই সালমা সঞ্চারিনী লতার মত সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে গেল। মেসের অনেকেই এই জলন্ত উল্কার দিকে বিষয়ে চেয়ে রইলো, দেখলো মেসের গেটে দামী মার্সিটিজ।

বাহ্, রুম তো নয় টুনটুনী পাখীর বাসা?

চমকে তাকায় আজাদ। দরোজায় দাঁড়িয়ে সালমা। মুখে মৃদু হাসি। আজাদ শশব্যস্তের ন্যায় বলে উঠে– তুমি! তুমি কেন মেসে এলে সালমা?

কেন? তুমি এখানে থাকতে পারো আর আমি বুঝি আসতে পারি না? বলেই সে রুমের চারদিক মনোযোগ দিয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগলো। আজাদ যেন ওকে তাড়িতাড়ি মেস থেকে বাইরে বের করতে পারলে বাঁচে।

সে বলে– চলো চলো কোথায় যেতে হবে। সালমা ওর কথায় কান না দিয়ে দোতালায় এসে ঘুরে ঘুরে বাথরুম কিচেন রুম সব দেখে। রান্নার উপকরণ দেখে সালমার মুখটা মলিন হয়ে যায়। সামান্য গুড়ো মাছ আর আলু–ডাল।

সে বলে– এই খেয়ে কিভাবে তুমি বাঁচবে আজাদ ভাইয়া? সালমার কণ্ঠে যেন ক্রন্দন ঝরে পড়ে।

এ দেশের কোটি কোটি মানুষ তো ঐ খাবারও পাচ্ছে না সালমা।

আমি তো কোটি মানুষের নয়– তোমার। বলেই সে গাড়ির দিকে চলে যায়। মেসের অনেকেই এই অগ্নি স্ফুলিংগের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। আজাদ নীরবে ওকে অনুসরণ করে।

সালমা, তোমার মধ্যে মাতৃরূপটা বড় বেশি।

কেন আজাদ ভাইয়া?

তুমি যেভাবে সবকিছু খুঁটে খুঁটে লক্ষ্য করো–রাতে কিভাবে আছি সুবিধায় না অসুবিধায় তা–ও তোমার দৃষ্টি এড়ায় না। বলেই আজাদ গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে হাসতে থাকে।

সালমা বলে–সেদিনের রাতের কথা বলছো তো? আমি প্রথম প্রথম আম্বার ঋণের কথা মনে করেই তোমার দিকে বেশি লক্ষ্য রেখেছি। কিন্তু সেই লক্ষ্য রাখাটাই যে আমার জন্যে–

যাক সে কথা। সেদিন কেন যেন আমার ঘুম আসছিল না। বাইরে এসে তোমার রুমে আলো জ্বলতে দেখে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তোমার মোনাজাত শুনলাম। আচ্ছা আজাদ ভাই, চাকরি তো আমাদের ওখানে থেকেও করা যেতো, কিন্তু চলে এলে কেন?

বড়ভাবী সব বুঝতে পেরেছে তা–কি তুমি জানো সালমা?

কি বুঝতে পেরেছে? বলেই সালমা গভীর আগ্রহে আজাদের মুখের দিকে তাকায়।

তোমার আমার........

তোমার আমার কি? কেমন যেন মোহাচ্ছন্ন কণ্ঠে সালমা বলেই মাথাটা এগিয়ে আনে আজাদের দিকে। পর মুহূর্তেই নিজেকে সে সংযত করে। ধীর কণ্ঠে সালমা আবার বলতে থাকে– তোমাকে বুঝতে না পারলে আমার সাধনা ব্যর্থ হবে আজাদ ভাইয়া– কিন্তু ভুল যেন না বুঝি এই দোয়া করো। ঐ বিশাল আকাশকে বুঝতে না পারলেও ওর মর্যাদা কমে না।

আমাকে অত উঁচুতে উঠিও না সালমা, আমি সামান্য মাটির মানুষ।

মাটির মানুষ সবাই আজাদ ভাইয়া, কিন্তু কোন কোন মাটিতে লবণাক্ততা এত বেশি থাকে যে, সেখানে ফসল হয়না। আমি যে কে তা সত্যিকার ভাবে বুঝতে পেরেছি তুমি আসার পরে। আমার ঝড়ো মেঘ কেটে গিয়েছে। এখন আমি শান্ত নীল আকাশ।

অপেক্ষা করো ঐ আকাশে অরুন্ধতি নক্ষত্র উদিত হবেই।

আজাদ ভাইয়া! যেন আর্তনাদ করে উঠে সালমা। এই তিন দিনেই তুমি বদলে গেলে?

বদলে আমি যাইনি সালমা। মেঘমুক্ত স্বচ্ছ আকাশে নক্ষত্র পুঞ্জ উঁকি দিবে এটাই স্বাভাবিক।

আমার আকাশে নক্ষত্র নেই– পূর্নিমার পূর্ণ শশী আছে।

ভালো কথা, ঐ চাঁদের কিরনেই আলোকিত হও।

এই দোয়াই করো আজাদ ভাইয়া– তোমার চাঁদই যেন চীরকাল আমার পৃথিবী আলোকিত করে রাখে।

গাড়ি বাড়ির গেটে প্রবেশ করে। চাকরি পাবার পরে এই প্রথম এলো আজাদ এ বাড়িতে। এখানে ও চিরকাল স্নেহ–ই পেয়েছে। কিন্তু ওর যে বিশেষ মর্যাদা আছে তা এবারই সে প্রথম বুঝলো। বাড়ির সবাই এমন ব্যবহার দেখাচ্ছে যেন বিশেষ কোন নিকট আত্মীয় দীর্ঘকাল পরে এসেছে। বাড়ির চাকরগুলো পর্যন্ত বার বার ছালাম জানাচ্ছে; ব্যাপার আর কিছুই না সালমার ছোট ভাই শাকিল ইংল্যান্ড থেকে যাকে বিয়ে করে এনেছে তার জন্মদিন। আজাদ এ সমস্ত বিজাতীয় প্রথাকে প্রচন্ডভাবে ঘৃণা করে। সে মনে করে জন্মদিন যদি একান্তই পালন করতে হয় তাহলে দোয়ার মাহফিলের আয়োজন করলেই তো চলে। ঐ বিজাতীয় কায়দায় কেক কাটা আর মোমবাতি জ্বালিয়ে নারী পুরুষের হৈ হল্লোড় করার মধ্যে আর যা–ই থাক সংস্কৃতির কোন নান্দনিক দিক নেই। যার জন্মদিন তার জন্যে সম্মিলিতভাবে আল্লাহর কাছে পবিত্র জীবন চেয়ে দোয়া করলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। তবে কেন কেক কেক কাটা রে বাবা, যত সব অনাসৃষ্টি।

আমন্ত্রিত অতিথিরা এসেছে। আহার পর্ব শেষে শাকিল বললো- অনেকেই তো গান গাইবে, তুমিও কিছু গাইবে আজাদ।

লজ্জা জড়িত কণ্ঠে কোন রকমে সে উত্তর দিল- আচ্ছা ভাইয়া। গান শুরু হলো। কেউ গাইলো নজরুল সঙ্গীত কেউ গাইলো আধুনিক বাংলা। একজন রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতেই শ্রোতাদের মধ্যে পরিচিতরা বলে উঠলো- রবীন্দ্র সঙ্গীত অনেক শুনেছি ও ঘুম পাড়ানি গান আর ভালো লাগেনা। এবার আজাদ ভাইয়া ইসলামী সঙ্গীত গাইলে ভালো হয়। আজাদ স্টেজে গিয়ে বসতেই সালমা এসে যন্ত্রধারীদের নিষেধ করলো মৃদু কণ্ঠে, কেউ যেন কোন কিছু না বাজায়। ওর শুধু কণ্ঠের গানই অমৃত বর্ষন করবে।

সালমার এক বান্ধবী কথাটা শুনে বললো- অমৃতের জায়গায় যেন গরল না বর্ষে।

সালমা ওর দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে শ্রোতাদের সারিতে গিয়ে বসলো। যেন আজাদকে সামনে থেকে দেখতে পায়। আজাদ গাইতে থাকে-

তুমি আছো হৃদয়ের গভীরে
ভুলবো তোমায় বলো কি করে।
দেখি নাই তোমারে কোন দিন- তবু আছো স্মরণে অমলিন
প্রেমেরও ভুবনে তোমারই বিরহ ব্যথা-নিশীথের শেফালীরা ঝরে
তোমায় ভুলে যদি যাই গো কভু- সে হবে আমারই পরাজয়
আমারো সকল আশার আলো- অবেলায় হারিয়ে যাবে হায়
তোমারে যতবার খুঁজেছি- কোরানের পথ ততো বুঝেছি
নিজেকে চিনেছি- হে রাসূল নবীজি
তোমারো পাঠানো ঠিকানা পড়ে
তুমি আছো হৃদয়ের গভীরে
ভুলবো তোমায় বলো কি করে।

গান শেষ হতেই সবাই তুমুল করতালি দিয়ে আজাদকে অভিনন্দন জানায়। আজাদ উঠে বাড়ির মধ্যে যায়। বড়ভাবী বললেন- আজাদ, তোমার ছুটির দিনগুলো এখানে এসে কাটাবে, কেমন? আজাদ সম্মতি জানিয়ে মেসে এসে এশার নামাজ আদায় করে শুয়ে পড়ে। হৃদয়ের কোথায় যেন আনন্দের ফল্গুধারা মাধুরী ছড়িয়ে দিচ্ছে।

তের

সঙ্গীতের আসরে যে কয়জন ছিল তাদের মধ্যে সালমার বান্ধবী রোজিনা অন্যতম। সুন্দরী, তরুণী ধনী কন্যা সঙ্গীত ও নৃত্যে পটু। পরদিন গানের কলেজে দেখা হতেই সালমাকে রোজিনা বললো- তোর আজাদ ভাইয়াকে দেখলাম সালমা, আধুনিক কালের যুবক যে অত দরদ দিয়ে নবী (দঃ) কে লক্ষ করে এমন ভাবে গাইতে পারে ভাবতে অবাক লাগে। কিন্তু ও মেয়েদের সম্পর্কে বড্ড বেশি উদাসিন।

তোর মত গন্ডমূর্খ আর দেখিনি রোজিনা? আজাদ ভাইয়া আল্লাহর প্রেমে পরিপূর্ণ ধ্যানস্থ এক সাধক। ওর ধ্যান ভাঙ্গাতে প্রয়োজন বেহেশ্তী বাণী সমন্বিত প্রেমময় কণ্ঠ। অত সাজসজ্জা করে ওর সামনে না-ই বা যেতিস।

সবাই যেমন যায় আমিও তাই গিয়েছিলাম। একটু থেমে রোজিনা আবার বলে-উনি বুঝি সাজসজ্জা পছন্দ করেন না?

সাজসজ্জায় আজাদ ভাইয়ার কোন কিছু যায় আসে না। ওকে যে চাইবে তাকে তাপসী রাবেয়া বশরীর মতই হতে হবে। ওর জন্যে তপস্যা করতে হবে।

ওরে বাবা, ঐ সামান্য এক কম্পিউটার অপারেটরের জন্যে?

হজ্ব করতে চাইলে কাবায় যেতে হয়, স্রষ্টাকে চিনতে চাইলে আগে নিজেকে চিনতে হয়। বলেই সালমা চলে গেল।

রোজিনা হাসতে হাসতে বলে- যা হোক সৃষ্টি ছাড়া মেয়ে রে বাবা।

কে রে? পারুল এসে প্রশ্ন করে। রোজিনা বলে-ঐ সালমা, অতবড় ধনীর মেয়ে, রূপ যৌবনে কোন কিছুরই অভাব নেই। আর ও কিনা ভালোবাসে এক কম্পিউটার অপারেটরকে।

যাঃ ওর ঐ আজাদ ভাইয়া তো? ভালোবাসে না করুণা করে। ওদের আশ্রিত জীব, পোষা কুকুরের উপরে যেমন মায়া ওর উপরেও তাই।

তুই জানিস কচু, ছেলেটাকে কালকে দেখলাম কি সুন্দর ফর্সা পৌরষ দীপ্ত চেহারা। কুকুর তো নয়-ই একেবারে রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

পুষতে চাস তো দেখ না-হাসে পারুল।

ওকে পোষা যায় না, একেবারে জঙ্গলে ব্যাপার। সালমাকেই ভালো মানায়। নিজেদের রসিকতায় দু' জনে খুব হাসে।

সালমা বাড়িতে আসতেই ওর আব্বা ওকে ডাকে-মা সালমা।

আসি আব্বা বলে সালমা ছুটে আব্বার কাছে এসে দাঁড়ায়।

খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে আমার কাছে আয় মা। সালমা খেয়ে সামান্যক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আব্বার সাথে বেলকনিতে মুখোমুখি দুটো চেয়ারে বসে। ওর আব্বা জিজ্ঞাসা করে–আজাদ এখান থেকে কেন চলে গেল মা? তুই কি কিছু জানিস?

হাঁা আব্বা, আমি ওর বড় ভাইয়ার লেখা পত্র পড়েছি। আজাদ ভাইয়া আমাদের এখানে আমাদের খরচে চলবে এটা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। আমাদের সাহায্য ওদের আত্মমর্যাদার জন্যে বিরাট আঘাত। আমরা কেন ঐ পঙ্গু মানুষটাকে কষ্ট দিবো আজাদ ভাইয়াকে ধরে রেখে। তাই ও চলে যাওয়াতে আমি বাধা দিইনি।

আমি আসাদের কাছে ঋণী হয়ে রইলাম মা।

না আব্বা, ঋণ ওরা দেয় না– দেয় ভালোবাসা, প্রতিদানের আশায় আসাদ চাচা তোমাকে সাহায্য করেনি আব্বা।

আসলে আমি এতদিন কেন ওদের সংবাদ নেইনি। বলে মঈন চৌধুরী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার বললেন–এ ভুল শোধরানোর কি কোন পথ নেই মা?

না আব্বা, এখন ওদের জন্যে কিছু করতে গেলে ওদের দৈন্যের আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়া হবে। তোমার বন্ধুর ছেলেরা বাইরে যতই গরীব হোক, অন্তরে ওরা রাজাধিরাজ। অন্য কোন স্বার্থান্বেষী মানুষ হলে তোমার দানকে দাবী বলে মনে করে অনেক কিছুই তোমার কাছ থেকে আদায় করে নিতো। সালমার কাজল কালো চোখের দিকে চাইলেন তার আব্বা–চোখ নয় যেন ব্যথার সরোবর। উপচে পড়ছে পানি। তবুও মুখে হাসি টেনে বললো সালমা–তুমি চিন্তা করো না আব্বা, নিজের চেষ্টাতেই আজাদ ভাইয়া এবার প্রতিষ্ঠিত হবে।

হাঁা মা, আমার এই ভুলটা আজাদও কি ক্ষমা করতে পারলো না?

ক্ষমার প্রশ্ন অবান্তর আব্বা। এটা তো ভুল নয়– দায়িত্বহীনতা। তোমার দায়িত্বের প্রতি উদাসিন তুমি ছিলে এ জন্যে তোমাকে কষ্ট পেতে হলো আব্বা। কিন্তু তুমি এখন অহংকার করতে পারো আব্বা।

কেন মা, এখন আমার কিসের অহংকার?

তোমার বন্ধুর ছেলের চরিত্রের অনুপম মাধুর্যতার জন্যে। মানুষ যে এতটা চরিত্রবান আর কঠোরে কোমলে মিশ্রিত হতে পারে ঐ আজাদ ভাইয়া তার বড় প্রমাণ। বলেই আব্বার মাথার চুলে হাত বুলাতে থাকে সালমা। পিতা কন্যার এই গোপন কথোপোকথন কেউ শুনলো না, এ ধরনের অনেক কথাই হয় তাদের মধ্যে। কথাগুলো মায়ামতায় জড়ানো, স্নেহের আর শ্রদ্ধার পরশে উষ্ণ।

স্বশব্দে ফোন বেজে উঠলো। আজাদ ফোন ধরতেই ওপাশ থেকে আদেশ এলো সালমার কণ্ঠে–আজকে সন্ধ্যায় ঢাকা ষ্টেডিয়ামে কুস্তি দেখতে যাবো, আমি আসবো তুমি অফিস ছুটির পরে মেসেই থাকবে। অব্যাহতি নেই আজাদ জানে, অতএব সম্মতি দিতেই হলো। সালমা বেলা তিনটার সময় একটা দেড় টনি ট্রাক ভাড়া করে খাট চেয়ার টেবিল আলনা বই রাখার জন্যে বেতের বুক সেলফ জাজিম আরো অনেক কিছু নিয়ে নিজে আগে আগে তার কারে চড়ে

এবং পিছনে ট্রাকসহ আজাদের মেসে এলো। লোকজন দিয়ে সব জিনিস উপরে উঠিয়ে মেসের একজন চাকরকে বললো–আজাদের ঘরের তালা ভাঙ্গতে।

সে কি? সাহেব রাগারাগি করবেন তো।

আমি বলছি তুমি ভাঙ্গো।

জ্বি না, আমার চাকরি যাবে, তার চেয়ে সাহেবের অপিস কাছেই আমি ডেকে আনি।

ডাকতে হবে না বলেই সালমা নীচ থেকে ড্রাইভারকে ডেকে এনে তালা ভেঙ্গে ওর হাতে দু'শত টাকা দিয়ে বললো একটা ভালো তালা কিনে আনো–আর হাঁা চাবী যেন দুটো থাকে।

নিজের হাতে রুম পরিষ্কার করে টেবিল চেয়ার খাট আর আলনা সেট করলো। খাটে জাজিম বিছিয়ে নতুন চাদর আর বালিশে নতুন কভার দিয়ে বিছানা পাতলো। একদিকে হিটার বসালো, মালটোভা আর ওভালটিন মাখনের কৌটা টেবিলে রেখে কয়েকটি আপেল কেটে একটি পিরিচে সাজালো। দেয়ালে কোরানের আয়াত সম্বলিত সুদৃশ্য কয়েকটি ছবি আর ক্যালেন্ডার সেটে দিল। এবার নিজেই তার নিজের করা কাজ দেখতে লাগলো। মুগ্ধ নয়নে সালমা দেখছে তার সাজানো সংসার। আজাদের সংসারে সে হৃদয়ের সুষমা ঢেলে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে। কাজল কালো টানা চোখে তার ভবিষ্যতের কত স্বপ্ন এসে ভীড় জমাচ্ছে।

আজাদ ছুটির পর অফিস থেকে এসে সালমাকে এ অবস্থায় তার রুমের দরোজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললো–এ সব কি হচ্ছে সালমা?

তোমাকে সাহায্য করছি। হেসে উত্তর দেয় সালমা।

এটাকে সাহায্য বলে না। করুণ কণ্ঠে বললো আজাদ।

কি বলে তাহলে? প্রশ্নটা হাস্যম্বারা আবৃত।

হৃদয়ের নৈবদ্য ঢেলে স্বপ্ননীড় রচনা করা। শান্তকণ্ঠ আজাদের।

বেশ স্বপ্ননীড়ই, এখন যাও হাত মুখ ধুয়ে এসো। বাইরে যাবো–

স্বপ্ন নীড় ব্যর্থ হলে কি করবে সালমা?

কি আবার করবো, সম্রাট শাহজাহান যা করেছে তা–ই করবো। আমি নারী হয়েই–

তাজমহল গড়বে?

হাঁা হৃদয়ে তাজমহল গড়বো।

যমুনা কোথায় পাবে সালমা?

না থাক যমুনা কাছাকাছি, দু'টি চোখেই যমুনাকে আমি ধরবো। সালমার কণ্ঠে যেন করুণ বীণা আর্তনাদ করে ওঠে। আজাদ সজল চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

সালমা তাড়া দেয় চলো চলো, দেরী হয়ে যাচ্ছে। দু'জনেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে গাড়িতে বসে। মেসের অনেকেই ওদের দিকে কেমন যেন চোখে তাকিয়ে থাকে। গাড়ি এসে একটি চাইনিজ রেষ্টুরেন্টের সামনে দাঁড়ায়। আজাদ ও সালমা রেষ্টুরেন্টের ভিতরে প্রবেশ করে টেবিল নিয়ে বসে। আজাদ বলে–কি ব্যাপার চাইনিজ খেতে হবে নাকি?

হ্যাঁ, কয় দিন থেকে কি খাচ্ছো তা চেহারা দেখেই অনুমান করা যায়। এসব না খেলে বাঁচবে কেমন করে?

চাইনিজ না খেয়েও বিস্তর লোক বাঁচে সালমা।

তর্ক করো না, খেতে এসেছি খাবে। আমার ইচ্ছে সপ্তাহে এক দিন আমরা একসাথে খাবো।

মানে আমাকে খাওয়াবে এই তো?

হ্যাঁ তাই। আচ্ছা আজাদ ভাইয়া, তোমাকে কি খাওয়াবার অধিকার আমার নেই? বলো নেই?

আছে–অবশ্যই আছে। আজাদ ইচ্ছে করেই "অবশ্যই" শব্দটার উপরে জোর দিল। আজাদের মুখে হাসি দেখে সালমা গম্ভির হয়ে জিজ্ঞাসা করলো–হাসছো যে?

মানুষ যখন নিজেকে অপরের দৃষ্টি দিয়ে দেখে তখন তার হাসিটা পরাজিতের হাসি।

অশেষ ধন্যবাদ তোমাকে। তাহলে পরাজয় স্বীকার করলে? সালমা বিজয়ীনির হাসি হাসলো।

পরাজয় বরণ সে দিন রাতেই করেছি। বলেই আজাদ হেসে উঠলো। সালমাও সে হাসিতে যোগ দিল। দু'জনে খেয়ে বাইরে আসতেই আজাদ বলে–সালমা, কুস্তি দেখতে না গিয়ে চলো মতিঝিলে কোরআনের তাফসীর শুনতে যাই।

কোরআনের তাফসীর শুনতে যাবে? বেশ চলো। তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আমি বাসায় চলে যাবো।

কেন, চলে যাবে কেন?

ওখানে কি মেয়েদের বসার জায়গা আছে?

আছে। কর্তৃপক্ষ সে ব্যবস্থাও করেছে। তবে তুমি আর আমি তাফসীর মাহফিলে না বসে রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে গাড়িতে বসেই শুনবো।

আচ্ছা চলো। আমি তো জীবনে এসব শোনার সুযোগ পাইনি, আজ চলো শুনে আসি। দু'জনে কোরআনের তাফসীর শুনে ফেরার পথে আজাদ ওর দিকে তাকায়। দেখে তাফসীর মাহফিলে এসে সালমা মাথায় কাপড় দিয়েছে এখনো তা দেওয়াই আছে। মাথায় কাপড় দেওয়া সালমাকে আজ যেন অপূর্ব লাগছে। আজাদ কিছুক্ষণ দেখে বলে- সালমা, কোরআনের তাফসীর তোমার কাছে কেমন লাগলো?

বোঝানো যাবে না আজাদ ভাইয়া, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় যখন অতীন্দ্রিয়তে ঝংকার তোলে তখন সে থাকে অনুভূতির কোঠায়, ভাষায় তাকে রূপ দেওয়া যায় না।

সালমার মুখে এ ধরনের কথা শুনে আজাদের চোখ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে বলে–একটা অনুরোধ রাখবে সালমা?

অনেক দিন পূর্বেই বলেছি আমি তোমার অনুরোধ রাখবো না–আদেশ রাখবো।

বেশ আদেশই। মাথায় কাপড় দেওয়াতে তোমাকে অপূর্ব লাগছে, হঠাৎ যেন তুমি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছো।

এই সেরেছে, তাহলে তো আর সময় নেই।

কিসের সময় নেই সালমা?

আমার, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছি তার মানে প্রদীপ নেভার আগে জ্বলে ওঠে। কিছুক্ষণ থেমে আবার সালমা বলে–মাথায় কাপড় দিলে আমাকে সুন্দর দেখায়! তার মানে আজ থেকে মাথায় কাপড় দিতে হবে এইতো?

আজাদ কোন কথা না বলে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসতে থাকে।

বেশ তাই হবে। আজ থেকে মাথায় কাপড়ই দিব।

আজাদকে যখন সালমা ওর মেসের গেটে নামিয়ে দিয়ে গেল তখন রাত দশটা বেজে গিয়েছে। প্রতি ছুটির দিনেই সালমা এসে আজাদকে নিয়ে কোন চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে গিয়ে খায়। এর মধ্যে আজাদের তিনটি উপন্যাস আর চারটি গানের ক্যাসেট বেরিয়েছে, তার বই প্রকাশ করেছে আশা প্রকাশনী। আর গান রেকর্ড করিয়েছে প্রফেসরস বুক কর্ণার। বই–এর সাথে এরা ক্যাসেটেরও ব্যবসা করে। আজাদ তার লেখা উপন্যাস তিনটি আর গানের ক্যাসেট চারটি সালমাকে দেয়। পরের সপ্তাহে সালমা এসেই বলে–নতুন আর কি লেখলে আজাদ ভাইয়া?

তোমাকে শোনাতে আমার বড্ড ভয় করে সালমা।

কেন? চুলচেরা সমালোচনা করি বলে?

হ্যাঁ।

ভালো তো অনেকেই বলে। আমি না হয় খারাপই বললাম, এতে কি তোমার কোন ক্ষতি হবে?

হবে, কে কোথায় ভালো বলে আর না বলে তা আমি শুনতে যাই না কিন্তু তোমার কাছ থেকে মন্তব্য না এলে আমি লেখায় উৎসাহ পাবো না।

ভালো না লাগলেও তোষামোদকারীর মত বলতে হবে নাকি, খুব ভালো হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে তোমার মত লেখক আর নেই? আমাকে যদি তোমার সাহিত্যিক বন্ধু মনে করো তাহলে তোমার ভুল ত্রুটি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেব।

তবে সালমা তোমার ভাষাটা বড় ক্ষুরধার।

ধার না হলে তো চলবে না। শীত মৌসুমে ধারাল অস্ত্র দিয়ে খেজুর গাছে ক্ষত সৃষ্টি করে তবেই না রস ঝরাতে হয়। তোমরা কবি সাহিত্যিকদেরও আঘাত না করলে হাত দিয়ে লেখা বের হয় না। আচ্ছা এখন চলো বাইরে যাই।

কোথায় যেতে হবে সালমা?

কোন দিন জানতে চাইবে না কোথায় যেতে হবে, আমি যেখানে যাই তুমি কি আমার সাথে যাবে না? কোমল কণ্ঠে সালমা কথাগুলো বলে আজাদের দিকে তাকায়।

তুমি যেতে বলবে আর আমি যাব না–এটা কি করে তুমি ভাবতে পারলে?

আজাদের বলার ধরন দেখে সালমা হেসে উঠে। দু'জনেই বের হয়ে যায়।

চৌদ্দ

পরের সপ্তাহে ছুটির দিনে সালমা ওর কাছে আসার পথে বাংলা মটর মোড়ের কাছে গাড়ি থামাতে বাধ্য হয়। মগবাজারের দিক থেকে বিশাল মিছিল আসছে। ইসলাম বিরোধী মহল ইসলাম সম্পর্কে যা-তা বলছে। এর প্রতিবাদে ইসলামের পক্ষের শক্তি প্রতিবাদ মিছিল করছে। মিছিলকারীরা প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় ঘেরাও করবে। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মতই মিছিল আসছে। মিছিল পার হয়ে যাবে তার পর রোড ক্লিয়ার হবে। কতক্ষণ লাগবে কে জানে, যত বড় মিছিল। এত বড় মিছিল সে জীবনেও দেখেনি। যা দেখেছে পত্রিকায় আর টিভিতে। হঠাৎ সালমার চোখ পড়ে মিছিলের ডান পাশে শ্লোগান মুখর আজাদের প্রতি। বজ্রমুষ্ঠি উত্তোলন করে আমিত তেজে–বীরবিক্রমে শ্লোগান দিচ্ছে, "ইসলামের অবমাননা–সহ্য করা হবে না", সালমা অবাক বিস্ময়ে আজাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। মিছিল ক্রমান্বয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। লক্ষ জনতার ভীড়ে সালমার চোখ থেকে আজাদ হারিয়ে যায়। সে ভাবতে থাকে এমনি করে আজাদ তার চোখ থেকে হারিয়ে যাবে না তো? না, না, এসব সে কি ভাবছে। আজাদ হারিয়ে যাবে কেন? ডিগ্রী পাস করলেই সালমা আজাদকে বিয়ের কথা বলবে।

সালমার আজকে মেসে যাওয়া হয় না। এখন তো মেসে যেয়ে লাভ নেই। সন্ধ্যার দিকেই যাওয়া যাবে। সালমা ড্রাইভারকে গাড়ি ঘুরিয়ে বাড়ির দিকে যেতে বলে। আজাদ মিছিল শেষ করে মেসে আসতে প্রায় পাঁচটা বেজে যায়।

কাজের ছেলেটাকে সালমা এসেছিল কিনা জিজ্ঞাসা করে। সে উত্তর দেয়–জ্বী, না আপামনি আসেনি। আজাদ নিজের রুমে গিয়ে জামা কাপড় ছাড়তেই কাজের ছেলেটা পানি গরম করে নিয়ে আসে। আজাদ আশ্চর্য হয়ে যায়। এমন তো কোনদিন এরা করেনি! আজ উপযাচক হয়েই পানি গরম করে এনেছে, ব্যাপার কি? সে জিজ্ঞাসা করে–না চাইতেই যে গরম পানি আনলি?

জ্বী, আপামনি বলে গেছে আপনাকে সকাল বিকাল মালটোভা ওভালটিনের জন্যে পানি গরম করে দিতে। আমাকে পঞ্চাশ টাকা বখশিশ দিয়ে গেছে, আরো দিবে বলেছে। আজাদের ঠোটের কোণে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। সে বলে–আচ্ছা, টেবিলের উপরে রেখে যা। আজাদ

ভাবে সালমা এসে ফিরে যায়নি তো? আর ফিরে যাবে কেন? ওর কাছে তো রুমের আর একটি চাবী আছে। রুমে প্রবেশ করে একটা কিছু অন্তত লিখে যেতে পারতো? আবার কখন আসবে না আসবে। ওর মধ্যে কেমন যেন অভিমান জাগে। খাবে না, খাবে না সে সালমার আনা মালটোভা। একটা কান্নার ঢেউ যেন তার বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। সালমার দেওয়া নরম বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। এই বালিশে যার মধুর স্পর্শ আছে, সে যে এখন কোথায় কে জানে।

ওঠো, ওঠো আজাদ ভাইয়া। প্রেমময় হৃদয়ের সুধা নিংড়ানো সুকোমল কণ্ঠের সুমিষ্ট ঝংকার। সালমা ডাকছে, ওঠো–কতক্ষণ হলো পানি দিয়ে গেছে। এঁ্যা, একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেছে আর খাওয়া যাবে না, আচ্ছা আমি পানি গরম করছি, তুমি হাত মুখ ধুয়ে এসে জামা কাপড় পরো। সালমা হিটারে পানি গরম করতে দেয়। আজাদ হাত মুখ ধুয়ে আসতেই সে আবার বলে–আমার কি দোষ, আমি তো আসছিলাম। তোমাকে মিছিলে দেখে ফিরে গিয়েছি। এখন তোমার জন্যে বাজার করতে দেরি হয়ে গেছে। তা অত রাগবার কি হয়েছে–

হাত মুখ মুছতে মুছতে আজাদ বলে–রাগ করিনি সালমা।

তবে অভিমান না অনুরাগ? মধুর হাসিতে ভরিয়ে ছিল রুমখানা।

আমি আবার অভিমান অনুরাগ করতে যাবো কেন, কার উপরে অভিমান অনুরাগ দেখাবো? আজাদের মুখ ছবি করুণ হয়ে উঠেছে। বুক ভরা ভালবাসা যার আছে সে-ই তো অভিমান করতে পারে। বলেই আজাদ জামা কাপড় পরতে থাকে।

হয়েছে হয়েছে, এখুনি অতো অভিমান করতে হবে না–সামনে অনেক দিন আছে। হাসছে সালমা।

সামনে কোন দিন আছে সালমা ?

কচি খোকা, কিছুই যেন বোঝে না।

আসলেই আমি কিছু বুঝি না, সালমা। বুঝলে–

বুঝলে কি আজাদ ভাইয়া ? গভীর কালো দুটো চোখ তুলে সালমা ওর মুখের দিকে তাকায়।

পতঙ্গ হয়ে আগুনে ঝাঁপ দিতাম না।

তুমি বুঝি আগুনে ঝাঁপ দিয়েছো ?

তাছাড়া আর কি, তোমার মত ধনীর দুলালী আমার জন্যে আগুনের মতই। জীবনে থাকলেও উত্তাপ – না থাকলেও ওর প্রচন্ড উত্তাপে জ্বলতে হবে।

এমন করে বলছো কেন আজাদ ভাইয়া? সালমার কণ্ঠ কেমন যেন বিষণ্ণ।

জানি না সালমা, আমার নিয়তি আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে।

নিয়তি তোমাকে আমার বুকেই নিয়ে আসবে। বলেই সালমা লজ্জায় যেন কুকড়ে যায়।

আজাদ বলে ওঠে–তোমার ভাষাটা একটু সংযত করলে ভালো হয়, নইলে আমল নামায় সব রেকর্ড হবে।

কি রেকর্ড হবে? বলেই গভীর আগ্রহ নিয়ে সালমা আজাদের দিকে তাকায়।

মানুষ যা বলে, করে, সব কিছু আল্লাহর ফেরেশতারা রেকর্ড করছে। সব কিছুর জন্যেই জবাবদিহি করতে হবে।

তাহলে কোন কিছু বলা যাবে না?

যাবে না কেন, বলতে হবে বৈধ সীমায় এসে।

বৈধ সীমা দিয়ে দিলেই পারো।

তুমি যা বলছো তার অর্থ বুঝো সালমা?

তোমার মনে হয় আমি না বুঝেই বলছি–না?

না, আমি বলছিলাম–

আর না না করতে হবে না, বিয়ের পরেই সব বলবো। এখন এটা খেয়ে চলো। বলেই সালমা ওভালটিনের এক গ্লাস আজাদের দিকে বাড়িয়ে দেয় আর এক গ্লাস নিজে নেয়।

আজাদ গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বলে হ্যাঁ বিয়ের পর বলাই ভালো।

ও আচ্ছা, আজ তাহলে চুপ করে থাকার প্রতিযোগিতা চলুক। সালমা নিঃশব্দে রুম থেকে বের হয়ে এসে গাড়িতে উঠলো। আজাদও নীরবে রুমে তালা দিয়ে সালমার অনুসরণ করলো। কারো মুখে কোন কথা নেই। ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছে। সালমা মাঝে মধ্যে বলে দিচ্ছে এই রোডে যাও ঐ রোডে যাও। আজাদ উদাস দৃষ্টি মেলে গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। কিন্তু কি আশ্চর্য। পরস্পরে কোন কথা হলো না ওদের। বাক্য স্রোত যেন রুদ্ধ হয়ে গেছে। নদী যেন সমুদ্রে মিশে স্থির শান্ত নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। তবুও নক্ষত্র মালার শব্দহীন উজ্জ্বলতা উভয়ের মুখে প্রভাময়।

রাত দশটা নাগাদ আজাদকে তার মেসের সামনে নামিয়ে দিয়ে সালমা বললো–চুপ করে থাকার প্রতিযোগিতায় আমি আজ পরাজিত হলাম আজাদ ভাইয়া, প্রতিযোগিতায় তুমিই জয়ী হলে।

গাড়ি চলে গেল। আজাদ তাকিয়ে রইলো গাড়ির আরোহী প্রেমময়ী সালমার দিকে। মনে মনে আবৃত্তি করলো–তোমার দেওয়া পুষ্পহার–সে তো মোর জীবনের যাতনায় মৃত্যুর মাধুরী।

পাঁচ ছয়টি পত্রিকায় আজাদের গল্প প্রকাশিত হলো।

সেখান থেকেও কিছু টাকা এলো। কয়েকটি বই–এর রয়্যালিটি ক্যাসেটের রয়্যালিটি আসছে। বেতনও তার চার হাজারে উন্নীত হয়েছে ব্যবহার আর কর্মদক্ষতার গুণে। এইচএসসির রেজাল্ট দু'জনেরই ভালই হয়েছে। আজাদকে সালমা বলেছিল ঢাকা কলেজেই থাকতে কিন্তু আজাদ থাকেনি–অন্য এক নাইট কলেজে ভর্তি হয়েছে। এখন মাসে গড়ে প্রায়

দশ হাজার টাকার মত আসছে। বাড়িতে সে বড় ভাই শফিককে বলেছিল–আপনাকে আর কষ্ট করে দোকানদারী করতে হবে না। ইনশাল্লাহ, আমি যা পাঠাবো তাতেই সংসার ভালো ভাবেই চলবে। শফিক বলেছিল–না–রে শুধু শুধু বসে থেকে কি হবে। দোকান থেকে তো বাজার খরচটা আসবে। বাড়ি ঘরের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করেছে আজাদ। আদরের রুমী আর মায়ের মত ভাবীকে এখন ছেঁড়া মলিন কাপড় পরে থাকতে হয় না। ভালো ভালো কাপড় ঢাকা থেকে আজাদ আনে। শফিককেও সে দামী লুঙ্গী আর পাঞ্জাবী কিনে দিয়েছে। আবার বলেছে আর খান কতক বই বের হলেই কয়েক বিঘা জমি কিনবে। চৌধুরী বাড়ির সাবেক জৌলুস আল্লাহর রহমতে সে ফিরিয়ে আনবেই। ঢাকা এসে আজাদের স্বাস্থ্য আরো ভালো হয়েছে। কিন্তু বাড়িতে গেলেই মায়ের মত মমতাময়ী ভাবী বলবে–তোর স্বাস্থ্য এমন শুকনা কেন, ভালো করে খাস না বুঝি? আজাদ ভাবীর ব্যাকুলতা দেখে মৃদু হেসে রুমীকে নিয়ে পুকুরে মাছ ধরতে চলে গিয়েছে।

আজ সালমা আসতেই আজাদ বলে–সালমা চলো একটু নীল ক্ষেতে যাই।

নীলক্ষেত, কেন?

চলোই না। বলে আজাদ রুম থেকে বের হয়ে আসে। আচ্ছা চলো। বলে সালমাও এসে গাড়িতে বসে। গাড়ি নীলক্ষেতে আসতেই আজাদ বলে–তুমি একটু অপেক্ষা করো আমি আসছি। সে পুরাতন বই এর দোকানে গিয়ে অনেকগুলো পুরাতন একেবারে জরাজীর্ণ বই কিনে নিয়ে গাড়িতে আসে। পুরাতন ময়লা বই দেখে সালমা চোখ কপালে তুলে বললো–আয় আল্লাহ, এসব কি কিনেছো তুমি? একেবারে পচা। এর মধ্যে তো অনেক রোগ জীবাণু আছে আজাদ ভাইয়া।

চিন্তার জীবাণুও আছে সালমা। আজাদ হাসতে হাসতে উত্তর দেয়।

তা ঠিক, কিন্তু ওরা রোগ প্রতিরোধক নয়–রোগকে ওরা ঠেকাতে পারে না।

না বরং রোগের বিস্তার দ্রুত ঘটায়। গরীবের ঘোড়া রোগ ধরলে কাঠের ঘোড়ারই খোঁজ করতে হয়। তাছাড়া এ সমস্ত বই নতুন পাওয়া কষ্টকর। আচ্ছা চলো মেসে যাই। গাড়ি চলতে আরম্ভ করে। রুমে প্রবেশ করে সালমা বলে–এ সমস্ত পুরাতন বই পড়ে কি করবে?

এ সমস্ত প্রাচীন সাহিত্য মন্থন করে পৃথিবীর মানুষের জন্যে আমি অমৃত উঠাতে চাই।

গরলও তো উঠতে পারে–বলে সালমা চা তৈরি করে আজাদকে দিল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললো–চলো আজ স্মৃতিসৌধের ওদিক থেকে খোলা হাওয়ায় বেড়িয়ে আসি।

এখানে এই ছাদেও বেশ খোলা হাওয়া।

না এটা রাজধানী ঢাকার ঘিঞ্জি এলাকা।

বাইরে যেতেই হবে সালমা?

অবশ্যই যেতে হবে, কারণ মহামিলনটা বাইরেই হয়, যেমন আকাশ আর বনবীথিকার শ্যামলীমায়–দিক চক্রবালের শেষপ্রান্ত যেখানে সাগরের বারিরাশির শুভ্র কিরিটে।

ওটা তো ঠিক মিলন না সালমা–মহা মিলনের শুধু আকুতি। ওখানে বিরাট শূন্যতা।

দূর থেকে তো মিলনের বন্ধনই দেখা যায়।

হ্যাঁ যায়, তাই বলে ওর শূন্যতা অস্বীকার করা যায় না। ওদের মহা মিলন ঘটবে মহা প্রলয়ে।

কেন, মহা প্রলয়ে কেন? সালমা প্রদীপ্ত চোখে আজাদের দিকে তাকায়।

চাঁদের প্রেম সাগরের সাথে, মহা মিলনের আকুতিতে ওদের বিরহ জোয়ারের আকারে অশ্রু হয়ে ঝরে, সূর্যের সাথে পৃথিবীর প্রেম চিরন্তন, মহা শূন্যতায় থেকে পৃথিবীকে উত্তপ্ত করে তোলে।

উত্তপ্ত করে না তুললে উষ্ণতায় ভরে না দিলে পৃথিবীতে তো নবপ্রাণের স্পন্দন ঘটবে না।

হাঁ মানব মানবীর উষ্ণতায়ও নবপ্রাণের স্পন্দন ঘটে। বাইরে মহাশূন্যতায় কোন উষ্ণতা নেই সালমা। ঐ দেখো ঐ গাছে খড়কুটো দিয়ে তৈরি ছোট্ট নীড়ে দুটো পাখি কি উষ্ণতায় পরস্পরকে সোহাগ করছে–

আজাদ কথাগুলো শেষ করে সালমার চোখের দিকে তাকাতেই তার দৃষ্টিতে ধরা পড়লো নিবিড় স্বপ্নীল প্রেমময় চোখে সালমা তার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর চোখে মহামিলনের আকুতি। আজাদ লজ্জায় আরক্ত হয়ে যায়। তার কবি মন আকস্মিকভাবে কার কাছে কি কথা প্রকাশ করেছে। এতক্ষণে সে যেন সেটা অনুভব করছে। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলিয়ে বললো–বাইরের ঐ মিলনটাই বড় মধুময় সালমা।

কেন, মধুময় কেন? সালমার কণ্ঠ আড়ষ্ট।

হ্যাঁ, শূন্যতা না থাকলে হাহাকার না থাকলে প্রেমের মাধুর্যতা হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায় না। ঐ আকাশ আর বনানীর সবুজ আভা ওর মধ্যে কত আকুলতা আর মধুময় ব্যকুলতা, ওদের ব্যকুলতা চির অক্ষয় হোক। বলেই সালমাসহ সে রুম থেকে বের হয়ে এসে গাড়িতে উঠলো। গাড়িতে বসে সালমা বলে– আকুলতা আর ব্যকুলতার পরে কি হয়?

ঐ ব্যকুলতার তো শেষ নেই সালমা, ওটা অশেষ, অনন্তকাল ধরে ওরা এই বিরহের মাধুর্যতা অনুভব করছে। ওদের মিলনের আকুতির মাঝেই মহামিলনের বিরহ বাণী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

অনেকক্ষণ দু'জনে গাড়িতে চড়ে আনমনে ঘুরলো। বিশেষ কোন কথা হলো না ওদের মধ্যে। আজাদ ভাবতে থাকে–বাষ্প যতক্ষণ বাষ্প থাকে ততক্ষণ তা শূন্যে বাতাসে ভেসে থাকে। কিন্তু শীতলতার সান্নিধ্যে এলেই তা পানি বিন্দু হয়ে শ্যামল বিথীকায় ফোটায় ফোটায় পড়ে।

কিন্তু যদি মরুর উষ্ণ বালুতে পড়ে, পড়তেও তো পারে। তাহলে, তাহলে সে কি করবে? সে উষ্ণতা সহ্য করার মত শক্তি তো তার নেই। তার আর সালমার মধ্যে যদি কখনো শূন্যতার সৃষ্টি হয়ই তাহলে সে যেন সে গুরুভার বহন করতে পারে। মনে মনে সে আল্লাহর কাছে শক্তি কামনা করে।

গাড়ি মেসের গেটে থামতেই সালমা বলে–আমি কয়েক দিনের জন্যে আমেরিকায় যাবো আজাদ ভাইয়া, বড় আপার বাচ্চা হবে। ওর কাছে কেউ একজন থাকা দরকার।

ও আচ্ছা–আমিও কালকে ছুটি নিয়ে কয়েক দিনের জন্যে বাড়িতে যাবো। তাহলে মাঝখানে বেশ কিছুদিন দেখা হবে না সালমা।

হ্যাঁ, মাঝখানে কিছু বিরহ জমা হোক, মধু জমে যেমন মোম হয়।

হ্যাঁ মধু জমলে মোম হয় তখন তা আর গড়িয়ে যায় না। ভয় নেই। আমেরিকায় গিয়ে আমি গড়িয়ে যাবো না। জমে শুধু তোমার জন্যে পাললিক শীলা হয়ে আসবো।

তুমি শীলা হয়ে আসবে, তাহলে তো আমাকে ছেনী হাতুড়ী রেডী করতে হয়।

হ্যাঁ করো, শিল্পীর নিষ্ঠুর ছেনীর আঘাত না এলে শীলার উপরে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় না– সালমা হাসতে হাসতে চলে যায়।

পনের

আজাদ রাতে বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে থাকে। আজ বিকাল থেকেই বুকের মধ্যে কেমন যেন ব্যথা ব্যাথা অনুভব হয়। গাড়ির মধ্যে গাড়ির ঝাকুনিতে মাঝে মধ্যে ব্যথাটা তীব্র হয়েছে কিন্তু সে সালমার সামনে প্রকাশ করেনি। এখন সে ব্যথাটা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। কিসের ব্যথা? বুকে তো সে কোনদিন আঘাত পায়নি? তাহলে এত ব্যথা কেন? বোধ হয় গ্যাসের ব্যথা হবে, গ্যাস ফরম করেছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে ব্যথা কমে আসলে সে ঘুমিয়ে পড়ে। পরের দিন বাড়িতে যায়। শফিকের হাতে কয়েক হাজার টাকা দিয়ে বলে–কিছু ধানি জমি কিনলে আর কিনে খেতে হবে না। এবার এসে বাড়ির কাজে হাত দিব। কয়েক দিন থেকে আবার ঢাকায় চলে আসে।

ঢাকায় হাজার মানুষ, কোলাহল পূর্ণ শহর। তবুও আজাদের কাছে মনে হয় সব শূন্য–ফাঁকা। কিছুই ভালো লাগে না। সব কিছু কেমন যেন বিস্বাদ লাগে। চাকরটা পানি গরম করে দিয়ে যায় ওভালটিন খাবার জন্যে। টেবিলের উপরে পানি ঠান্ডা হয়ে যায়, মন চায় না ওভালটিন খেতে। কেমন যেন একটা বোবা কান্না আজাদের হৃদয়ে গুমরে ফিরে। সালমা ওকে ছেড়ে এতদিন থাকতে পারে? এই রুমের সব কিছুতে ওর পেলব হাতের সুষমা জড়িয়ে আছে। যে দিকেই তাকায় শুধু সালমারই স্মৃতি, এ রুমের সব কিছুই সালমার উপস্থিতি সগৌরবে ঘোষণা করছে। আজাদ তৃষ্ণ নয়নে রুমের প্রতিটি জিনিসের দিকে চেয়ে থাকে। নিজের অজান্তেই চোখ দুটি তার ঝাপসা হয়ে আসে। কি করবে, কোথায় গেলে ভালো লাগবে? ওদের বাড়িতে কোন ছলে একটা ফোন করলে হয় না? তাহলে তো জানা যাবে কবে সালমা আসবে।

না, না, ছল কেন করবে সে। এত লুকোচুরির কি আছে। সে তো এমনিতেই বড়ভাবীর কাছ থেকে সালমার আসার খবর জেনে নিতে পারে। কালই অফিসে গিয়ে সে ফোন করবে সালমাদের বাড়িতে।

প্রফেসরস বুক কর্নারের সেলসম্যান সাদী মেসে এসে বলে –আমিন ভাই আপনাকে ডেকেছে।

কেন সাদী? আজাদ জানতে চায়।

আপনার পাঁচ নম্বর ক্যাসেটের জন্যে শ্রোতারা বড় বিরক্ত করছে, ওটা বোধ হয় রেকর্ড করবে।

আচ্ছা আপনি যান আমি আসছি।

প্রফেসরস বুক কর্নারের মালিক আমিনুল ইসলাম বড়ই হৃদয়বান, তার ব্যবসার মধ্যে সততা আছে। অনেকে ক্যাসেটের এক হাজার কপির কথা বলে গোপনে দু'হাজার তিন হাজার কপি করে। গায়ককে বলে এক হাজার কপি করেছি–এই যে আপনার রয়্যালিটির টাকা। বাকি কপিগুলোর রয়্যালিটি আত্মসাৎ করে। কিন্তু আমিনুল সাহেব আল্লাহভীরু সৎ লোক। তিনি বলেন– আমি অন্যায়ভাবে বেশি কপি তৈরি করে বেচবো তারপর আল্লাহ্ যখন কেয়ামতের মাঠে এই অন্যায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে তখন কি জবাব দিবো? এ জন্যে তিনি ইনসাফের সাথেই লেন-দেন করেন।

আজাদ আসতেই তিনি বললেন–আজকে রাতে আপনার হাতে যদি সময় থাকে তাহলে পাঁচ নম্বরটা রেকর্ড করা যায়।

ঠিক আছে আমিন ভাই, আমি এশার নামাজ পড়ে আপনার স্টুডিওতে চলে আসবো, এখন আসি। বলেই আজাদ চলে যেতে উদ্যত হয়।

সে কি চলে যাচ্ছেন যে? চা খেয়ে যান। এই সাদী চায়ের অর্ডার দিয়ে আসো। আর আপনার কিছু টাকা বাকি ছিল নিয়ে যান। বলেই আমিন সাহেব একশত টাকার নোটের একটি বান্ডিল আজাদের দিকে এগিয়ে দেয়।

আজাদ টাকার বান্ডিল পকেটে পুরে বলে–এই মাত্র চা খেয়েছি এখন আর খাবো না আমিন ভাই, আচ্ছা আসি। গান রেকর্ড করে মেসে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায়। আজাদের বুকের ব্যথাটা যেন আরো বেড়ে যায়। মনে মনে বলে– ডাক্তার না দেখালেই না। কালই বডি চেক-আপ করতে হবে। ব্যথা কিছুটা কমে এলে সে নতুন উপন্যাসটা শেষ করার জন্যে টেবিলে বসে।

পরের দিন অফিসে যেয়ে কম্পিউটার নিয়ে আজাদ মগ্ন হয়ে পড়ে। ঝন ঝন শব্দে টেলিফোন বেজে উঠতেই আজাদ ফোনের রিসিভার তুলে কানের কাছে ধরে–

হ্যালো আজাদ ভাইয়া, আমি কাল বেলা বারোটার ফ্লাইটে আসছি বিকালে তোমার মেসে আসবো। ছুটির পরে বাইরে যেওনা, সুদূর আমেরিকা থেকে সালমার আবেগময় কণ্ঠ ভেসে আসে। লাইন কেটে যায়। ইচ্ছে থাকার পরও আজাদ কোন কথা বলতে পারে না। মেঘের

আশায় তৃষ্ণার্ত চাতক বৃষ্টির পানি পেলে যেমন আনন্দিত হয় আজাদের অবস্থা এখন তেমনি। অনেক দিন পর প্রিয় কণ্ঠের ঝংকারের রেশ কয়েক মুহূর্ত আজাদকে যেন মোহাবিষ্ট করে রাখে।

অফিস থেকে সে সোজা চলে যায় মেসে। হাত মুখ ধুয়ে রুমে প্রবেশ করে হিটারে গরম পানি বসিয়ে দিতেই সালমা ছালাম দিয়ে রুমে প্রবেশ করে। বোরখাবৃত স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুন্দরী তন্বী তরুণী সালমা। কালো বোরখার উপরে সোনালী জরীর কাজ করা। একটা বেহেশ্তী পবিত্রতায় সালমার দেহ মন আচ্ছন্ন। অবাক বিস্ময়ে আজাদ অপলক নেত্রে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। বিস্ময়ের ধাক্কায় আজাদের মুখে কোন ভাষা নেই। সালমার শরীরে বোরখা। তাও আবার আমেরিকার মত অশ্লিল ন্যাংটা সভ্যতার দেশ থেকে এসেই। আশ্চর্যই নয় শুধু–কল্পনারও অতীত।

কি হলো, বসতে বলবে না? অমন হাঁ করে কি দেখছো আজাদ ভাইয়া?

তুমি–তুমি বোরখা–

হ্যাঁ পরেছি, এতে এতো অবাক হবার কি হয়েছে বুঝলাম না।

অবাক হইনি, নতুনত্বের চমকে ঘাবড়ে গেছি।

নতুনত্বের কিছুই নেই, অনেক অপমান করেছি।

অপমান করেছো! কাকে?

আমার নারীত্বকে মাতৃত্বকে–তাই বোরখার আবরণে আবার নিজের নারীত্বকে তার সঠিক আসনে আসীন করতে চাই আজাদ ভাইয়া।

বাড়িতে কেউ কোন আপত্তি করেনি, ভাবীরা?

কারো কোন কিছু বলাতে–আপত্তি করাতে আমার কিছু যায় আসে না। আল্লাহর কাছে আমার হিসেব ওরা দিবে না। আমাকেই দিতে হবে।

এ অনুভূতি তোমার কখন আসলো সালমা?

আমেরিকার ন্যাংটা সভ্যতা নিজ চোখে দেখে।

কেন ও সব দেশ তো নারী মুক্তির–সমান অধিকারের দেশ–কতকটা যেন ব্যঙ্গ করেই বলে আজাদ।

মিথ্যে কথা, ওসব কথা ওদের বাইরের আবরণ, চোখে ধুলো দিয়ে নারীর যৌবনকে ইচ্ছেমত ভোগ করার ফাঁকা বুলি।

আজাদ বুঝতে পারে সালমার হৃদয়ের গোপন চাঁদ এতো দিনে আলো ছড়াতে শুরু করেছে। বলে–নিজেকে আবিষ্কার করতে পেরেছো জেনো সুখী হলাম। ওর কথা শুনে সালমা হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে তুললো। সে ব্যাগ থেকে আজাদের জন্যে আনা সার্ট প্যান্ট আরো কত কি বের করে সাজিয়ে রাখছে আর গল্প করছে। এত দিনের জমানো কথা যেন

শেষ হতে চায় না। একটানা কথা বলেই চলেছে সালমা। শেষে আজাদ বলে–বাড়িতে কে কেমন আছে সে সম্পর্কে তো কিছু বললে না। তারপর বড় আপার কি হলো না হলো–

মাফ করো ভুলেই গিয়েছিলাম–বাড়ির সবাই ভালই আছে আর বড় আপার একটা ছেলে হয়েছে, খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে। তারপর তোমার বাড়ির কি খবর? ভাইয়া ভাবী আর রুমী কেমন আছে?

আল্লাহর ইচ্ছায় সবাই ভালো আছে।

সবাইকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে আজাদ ভাইয়া।

দেখবে, অবশ্যই দেখবে।

আগামীকাল ছুটির পরে আমাদের বাড়িতে আসবে, আমি এখন যাই। আর হ্যাঁ, আজকের আনা জামা প্যান্ট জুতো পরে যাবে।

কেন অন্যগুলো পরে গেলে কি হবে?

বাঃ রে, অতদূর থেকে টেনে এনেছি, আমি দেখবো না তোমাকে কেমন দেখায়।

আচ্ছা আচ্ছা তাই হবে। বলে আজাদ মৃদু হাসতে থাকে।

সালমা বোরখার নেকাবটা মুখে টেনে চলে যায়। আজাদও নিজের সব কিছু চেক–আপ করার জন্যে ইবনে সিনা চেক–আপ ইউনিটের উদ্দেশ্যে বেবী ট্যাক্সী নিয়ে রওয়ানা দেয়।

ওখানে ডাক্তার মুকুল সাহেবকে ধরলে তিনি একদিনেই সব কিছু চেক–আপের ব্যবস্থা করে দেন। পরের দিন সন্ধ্যায় রিপোর্ট নিতে বলেন ডাক্তার মুকুল।

আজ আর কম্পিউটারের কি বোর্ডে যেন আঙ্গুল চলে না আজাদের। ক্লান্তিতে গোটা শরীর যেন ভেঙ্গে আসতে চাইছে। কি হলো ওর? বুকের সেই ব্যথাটাও কেমন যেন চিন চিন করছে। হাতে আর্জেন্ট কাজ। ছুটি চাইবে কেমন করে তবুও সে কাজ করতে থাকে, হঠাৎ ফোন বেজে উঠে। আজাদ ফোন ধরতেই সালমার বড় ভাই ফাহাদের গম্ভীর কণ্ঠ শোনা যায়–

আজকে একটু আসতে পারবে আজাদ?

জ্বী ভাইয়া আসবো, আপনার শরীর ভালো তো?

হ্যাঁ ভালই আছি, তুমি কিন্তু আসবে। বলেই ফাহাদ ফোন ছেড়ে দেয়। আজাদ কেমন যেন ধাক্কা খায়। কোন দিন তো ফাহাদ ভাইয়া ফোন করেন না–কোন অঘটন নয় তো? সালমা কিছু ঘটায়নি তো? এমনিতে শরীর খারাপ লাগছে, তার উপরে ফাহাদের ফোন পেয়ে আজাদ দুঃশ্চিন্তায় ভেঙ্গে পড়ে। সে ছুটি নিয়ে মেসে এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়। তারপর আমেরিকায় থেকে সালমার আনা জামা কাপড় পরে গুলশান সালমাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে রুম থেকে বের হয়ে নীচে গেটের কাছে আসতেই দেখে সালমাদের গাড়ির ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে নামছে। আজাদকে দেখেই বলে–আস্সালামু আলায়কুম ভাইয়া, বড় ভাই গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আজাদের মধ্যে কেমন যেন ভাবান্তর দেখা দেয়। ব্যাপার কি? সালমা না এসে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে কেন? কি এতো জরুরি যে একবার ফোন আবার গাড়ি–যাক গিয়েই দেখা যাক। আল্লাহর নাম নিয়ে আজাদ গাড়িতে উঠে বসে।

সালমাদের বাড়িতে আসতেই বাড়ির সবাই ওকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু সালমা, সালমা কোথায়? ওকে দেখা যাচ্ছে না কেন?

বড় ভাবী আজাদকে নিজের বেড রুমে নিয়ে যান। কাটা আপেল আর কিছু আঙ্গুর ওর সামনে দিয়ে বলে–খাও ভাইয়া। আজাদ খেতে খেতে বলে–বড় ভাই যে আমাকে ডেকে পাঠালো?

আসলে আমিই ডেকে পাঠিয়েছি তোমার ভাইয়ার মাধ্যমে।

কি ব্যাপার ভাবী, এতো জরুরি তলব? আমি তো ভাইয়ার ফোন তারপর গাড়ি দেখে ভয়ই পেয়েছিলাম।

এতো ভীতু হলে চলবে কেন, সাহসী হতে হবে। তোমাকে যেন কেমন দুর্বল দেখাচ্ছে। মেসে খাওয়া দাওয়া বোধহয় ভালো হচ্ছে না আজাদ। তা এখানে থেকে অফিস করলে হয় না ভাই ?

না ভাবী, খাওয়া দাওয়া ঠিকই আছে, কয়েক দিন ধরে শরীরটা কেমন যেন করছে। আর তাছাড়া আপনারা মায়ের জাত ভাবী, আপনাদের চোখে আগে আপনজনদের স্বাস্থ্য চেহারাই নজরে পড়ে। যেমন আমার ভাবী, স্বাস্থ্য ভালো হলেও বলবে–আজাদ তুই একবারে শুকিয়ে গেছিস।

তোমার ভাবীর মত কি আর আমি হতে পারবো ভাই, তিনি তোমাকে সেই তিন বছর বয়স থেকে লালন পালন করে এতবড় করেছেন।

হ্যাঁ বড়ভাবী, আমার ভাবী আমাকে মায়ের অভাব বুঝতে দেননি। এবার বলুন কি জন্যে ডেকেছেন?

আজাদ, এ বাড়ির মেয়েরা এসএসসি পাস করলেই তোমার চাচা বিয়ে দিয়ে দিয়েছে, শুধু ব্যতিক্রম হলো সালমা। তবুও তুমি যাবার পর থেকে আমরা অনেক চেষ্টা করেছি ওকে বিয়ে দেওয়ার জন্যে। কিন্তু কাউকে ও পছন্দ করছে না।

তাহলে আমি কি করবো? বোকার মতই বলে বসে আজাদ।

তোমাকে কিছু করতে হবে না গাধা, যা করার আমরাই করবো। সালমা আর তুমি যে পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসো তা শুধু আমিই জানতাম। কিন্তু এখন বাড়ির সবাই বুঝে গেছে কেন ও বিয়ে করতে রাজী হচ্ছে না, আর কাকেই বা ও চায়।

কি করে বুঝলো ভাবী? কোন রকমে ঢোক গিলে বললো আজাদ।

ভয় পাবার কিছু হয়নি আজাদ, ওর বোরখা পরা দেখেই সবাই বুঝে ফেলেছে।

কি বুঝে ফেলেছে?

ও তোমার মত ছেলের স্ত্রী হবার যোগ্য করে নিজেকে গড়ছে। এবার তোমার মতামত বলো?

আমি–আমি কি বলবো ভাবী। আমি তো এ ভাবতেই পারছি না। চাচা কি মনে করবে?

চাচা তোমার মত ছেলেকে জামাই হিসেবে পেলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করবে। তোমার ভাইয়ারা, চাচা, চাচী এখন তোমার মতের অপেক্ষা করছে।

আমি, আমি আজ যাই ভাবী, পরে আসবো। বলেই আজাদ চলে যেতে থাকে। বড় ভাবী পিছন পিছন আসতে থাকে আর বলতে থাকে–খেয়ে যাও আজাদ।

না ভাবী না, অন্য দিন।

তাহলে গাড়ি নিয়ে যাও।

গাড়ি লাগবে না, বাসেই যেতে পারবো। আজাদ যেন পালিয়ে যাচ্ছে, এমন শশব্যস্তে সালমাদের বাড়ি থেকে বের হয়ে এলো। পথে সে মসজিদে মাগরিবের নামাজ আদায় করে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানায়। তারপর স্কুটার নিয়ে মেসের দিকে রওয়ানা দেয়। নাহ আজকে আর চেক–আপের রিপোর্ট আনতে যাওয়া হলো না। কালকে ছুটির পরেই যাওয়া যাবে। খাওয়া–দাওয়া সেরে আজাদ তার রুমে যায়। রুমের প্রতিটি জিনিসের দিকে তাকিয়ে তার দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হৃদয়ের কোন গোপন কুঠুরীতে কে যেন আনন্দ বীণার মসৃণ তারে খুশীর ঝংকার তুলছে। সে বেহেশ্‌তী সুরের মূর্ছনায় আজাদ যেন মূর্ছিত হয়ে পড়ছে। নিজের দেহের পোশাক পরিচ্ছদের দিকে প্রেমভরা দৃষ্টিতে তাকায়। আবার দেখে সম্মুখে আরামদায়ক শয্যা। যেখানে রয়েছে সালমার পেলব আঙ্গুলের প্রেমময় স্পর্শ। সবকিছুই যেন আজাদের চোখে আজ খুশীর লহরী সৃষ্টি করে। শয্যায় শুয়ে একটি বালিশ বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে হাত বুলাতে থাকে। এই বালিশেও তো তারই মধুময় স্পর্শ–প্রেমের আবেশ। সে আবেশে চোখ বুজে। যা কোন দিন সে কল্পনা করেনি–স্বপ্নেও দেখেনি, আজ কিনা তাই বাস্তবে হতে যাচ্ছে! কিন্তু ওর ভাইয়া কি সালমার সাথে ওকে বিয়ে দিতে রাজী হবে? ওদের মত ধনীর ঘরে তাকে বিয়ে দিতে ভাইয়ার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগবে। না, না, আঘাতের কি আছে, সে তো আর সালমার আব্বার টাকা পয়সা নিচ্ছে না তাদের কোন সম্পদও ওদের ঘরে আসছে না–শুধু সালমাই আসছে। ওরা সবাই মিলে তাদের জীর্ণ কুঠিরে সালমাকে পাঠাচ্ছে। পাঠাচ্ছে, না সালমার জিদের কাছে বোধ হয় ওরা নতি স্বীকার করেছে। নতি স্বীকার করার কি আছে? সে তো আর অযোগ্য নয়। লেখাপড়াও চালিয়ে যাচ্ছে, তার গানের ক্যাসেট ও লেখা বই থেকে অনেক টাকা আসছে, আগামীতে আরো বেশি আসবে। সুতরাং ভাইয়ার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগার প্রশ্নই আসে না। ভাইয়া সানন্দেই রাজী হবে ইনশাল্লাহ।

কিন্তু ওর চোখে ঘুম কেন আসছে না? দু' দিন পরেই তো সে তারই স্ত্রী হয়ে আসছে। হাঁ, সালমা হবে তারই জীবন সঙ্গীনী। আজাদ বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে থাকে। ঘুম আর তার চোখে আসে না। খুশীর বন্যায় ঘুম বোধ হয় ভেসে গিয়েছে, দূরে–বহুদূরে। আজাদ

শয্যা ত্যাগ করে ছাদে এসে আকাশের দিকে তাকায়। আকাশ ভরা নক্ষত্রমালা মিটি মিটি জ্বলছে। নক্ষত্রগুলো ওকে বিদ্রূপ করছে নাকি? না বিদ্রূপ করবে কেন। সে তো অবৈধ কিছু করেনি। যৌবনের পিচ্ছিল পথে অনিন্দ সুন্দরী তন্বী ষোড়শী যুবতী সালমাকে এত কাছে পেয়েও সে নিজেকে আল্লাহর ভয়ে নিয়ন্ত্রণ করেছে। আজাদ আবার রুমে প্রবেশ করে শয্যায় শুয়ে পড়ে। গভীর ঘুমে স্বপ্নের রাজ্যে হারিয়ে যায়।

ষোল

ফজরের আযান কানে আসতেই আজাদ নামাজের জন্য অজুর প্রয়োজনে দোতলায় বাথরুমের দিকে যায়। শরীরটার কি হলো, গোটা শরীরে এত ব্যথা কেন–পা–যে চলতে চায় না। হাঁটুর কাছে যেন ভেঙ্গে আসছে। শুধু হাঁটুই নয় সারা শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সংযোগে ব্যথা যেন বিদ্যুতের মতই ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক কষ্টে আজাদ নামাজ আদায় করে, আবার শুয়ে পড়ে। অফিসে আর যাওয়া হয় না। দশটার দিকে সে ইবনে সিনা চেক–আপ ইউনিটে যায় রিপোর্ট আনার জন্য। ডাক্তার গম্ভীর মুখে তার দিকে রিপোর্ট এগিয়ে বলে–কত দিন ধরে এই ব্যাধি সৃষ্টি করেছেন?

কি–কি হয়েছে আমার? ব্যগ্র কণ্ঠে আজাদ জিজ্ঞাসা করে। ডাক্তার অনেকক্ষণ করুণভাবে ওর পাণ্ডু চেহারার দিকে চেয়ে থেকে বলে–আপনি বাড়ি চলে যান, এ রোগের কোন চিকিৎসা নেই। ঔষধ–পাতি দিয়ে কিছু দিনের জন্য হয়তো টিকে থাকা যাবে। কিন্তু ক্যান্সার মানুষকে চিরতরে বিদায় করতেই আসে।

ক্যান্সার! আজাদ যেন আর্তনাদ করে উঠে।

মুহূর্তে আজাদের মাথাটা বন বন করে ঘুরে উঠে। চোখের সামনে সমস্ত আলোগুলো যেন দপ করে নিভে যায়। এতটুকু বাতাসের জন্য ওর হৃদপিন্ড যেন আকুতি বিকুতি করতে থাকে। শ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে। টলতে টলতে আজাদ এসে স্কুটারে উঠে। কোন রকমে শুষ্ক কণ্ঠে ড্রাইভারকে বলে– মগবাজার গ্রীনওয়ে। নিজের কণ্ঠ ওর কাছে যেন অপরিচিত মনে হয়। মাথাটা বেবীর পিছনে কাৎ করে দিয়ে স্পন্দন হীনের মতই আজাদ পড়ে থাকে। ড্রাইভারের ডাকে সম্বিত ফিরে পায়। গ্রীনওয়ে এসে গেছে স্যার।

এ্যাঁ–আচ্ছা নামছি। আজাদের কণ্ঠ বিষণ্ন। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে মদ্যপের মত টলতে টলতে সে গিয়ে শয্যায় লুটিয়ে পড়ে। শেষ– সবই শেষ। তার জীবনের সমস্ত স্বপ্নের এখানেই ইতি। পৃথিবীতে এসে সে শুধু পরাজিতই হয়েছে। আজাদ ভাবছে, শৈশবে পিতা মাতার স্নেহও পায়নি–ভাইয়া ভাবী সে অভাব পূরণ করেছেন। আজ সে চাকরি করছে, ভালো বেতন পাচ্ছে, তার লেখা বই এবং গানের ক্যাসেট থেকে প্রচুর টাকা আসছে। সাফল্য যখন পদ চুম্বন করছে, সাহিত্যে– ইসলামী সঙ্গীতে যখন তার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে

ঠিক তখনই কালব্যাধি তাকে গ্রাস করলো–ক্যান্সার মরণ ছোবল দিল। সর্বত্র তাই বিফলতা। আবার যেটা সে কোন দিন কল্পনাও করতে পারেনি সেই জান্নাতী প্রেম এলো তার জীবনে। এমন নিবিড় হয়ে এলো যে শ্রাবণের অবিরাম বর্ষণ–কিন্তু হায়রে নিয়তি! জীবন পাত্র যখন বেহেশ্‌তী সুধায় পরিপূর্ণ তখন সে পাত্রও হয়ে উঠলো অভিশপ্ত। সে চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ চলেই যাচ্ছে এই আলোছায়া ঘেরা শ্যামল বন বিথিকা–পুষ্প কাননে পরিপূর্ণ পৃথিবী থেকে, সালমাকে ছেড়ে। হয়ত সে বেঁচে থাকবে কিছু দিন–তার গাওয়া ইসলামী সঙ্গীতের ক্যাসেটে, কোন বইএর দোকানে, পাঠকের অন্তরে। ওর গান শুনে বা বই পড়ে মানুষ হয়ত খারাপ বলবে– নিন্দে করবে–কেউ প্রশংসা করবে। কিন্তু আজাদ সব নিন্দে আর প্রশংসার উর্ধে–অনেক উর্ধে চলে যাবে। সে পারলো না সাহিত্যের জগতে ইসলামের আলো জ্বালতে। আগামীতে আল্লাহ হয়ত অন্য কাউকে নির্বাচিত করবে সাহিত্যে উপন্যাসে ইসলামের মহাসত্যের প্রদীপ জ্বালতে, আল্লাহর ইচ্ছাতেই ওর সন্তুষ্টি। তার হয়ত অভিপ্রায় নয় সে আরো কিছুদিন এই পৃথিবীতে বিচরণ করুক। মনে শুধু একটিই কষ্ট রয়ে গেল– সে ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজের জীবন দান করতে পারলো না। তার বড় ভাই আল্লাহর রাস্তায় পা দান করেছে, আর সে চেয়েছিল জীবন দান করতে। তবুও এটাই তার বড় সান্ত্বনা, হাদিসে সে পড়েছে শহীদ হওয়ার আকাংখা নিয়ে অন্য কোনভাবে মৃত্যুবরণ করলেও সে আল্লাহর কাছে শহীদের মর্যাদাই লাভ করবে।

তার পক্ষে আর চাকরি করাও সম্ভব না। কালই সে ইস্তফা দিবে। এখন যে কয়দিন টিকে থাকে সে কয়দিন শুধু সে লিখবে। বাড়িতে ভাইয়াকে সব জানাতে হবে। সমস্ত বই–এর আর ক্যাসেটের স্বত্ব আদরের রুমীর নামে লিখে দিয়ে যাবে। আর সালমা–সালমাকে কি সে সব জানাবে? সে কি বলবে সালমা আমি তোমার জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছি। না, সে বলবে না। বললে সালমা এবং ওর আব্বা প্রয়োজনে ওর পিছনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করবে, কিন্তু কোনই ফল হবে না। অতএব সালমাকে সে কিছুই জানতে দেবে না। নীরবে নিঃশব্দে সে ওর জীবন থেকে সরে আসবে। আকাশের চাঁদকে মাটিতে নামিয়ে গোটা পৃথিবীকে সে আলো থেকে বঞ্চিত করবে না। সালমাকে সে সালমার প্রকৃত আসনে বসার সুযোগ করে দিবে। ওকে কঠিন আঘাত হানতে হবে। হ্যাঁ, সে সালমাকে নির্মম আঘাতই হানবে। যেন সালমা ওকে ঘৃণা করে, ভুলে যায়। ওকে যেন কাপুরুষ ভেবে সালমা ওকে ত্যাগ করে। অতএব আগামীকাল থেকেই সে আঘাত করবে।

পরের দিন সকালে সে অফিসে গিয়ে শারীরিক অসুস্থতা দেখিয়ে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে প্রফেসরস বুক কর্ণারের মালিক আমিন সাহেবের কাছে গিয়ে সব কিছু আদরের রুমীর নামে লিখে দিয়ে, বাংলাবাজার তরফদার প্রকাশনীর মালিক সিরাজুল আলমকে ফোনে তার মেসে আসতে অনুরোধ করে ঔষধের দোকানে গেল কয়েকটি প্রয়োজনীয় ঔষধের জন্যে। ঔষধ খেয়ে আর কি হবে? না, না, ঔষধ খেয়ে কিছু দিন তাকে সচল থাকতে হবে–চলাফেরা করার শক্তি সঞ্চয় করতে হবে শরীরে। অতএব ঔষধ খেতে হবে। ঔষধ এনে তার রুমে

প্রবেশ করে সে থমকে দাঁড়ায়। এ রুমের সব কিছুতেই সালমার হাতের স্বপ্নীল স্পর্শ। কত আশা নিয়ে, দু'চোখে কত স্বপ্ন নিয়ে–বুক ভরা আশা নিয়ে সালমা সাজিয়েছে তার সংসার। কি করে ঐ স্বপ্নময়ীর স্বপ্ন সে ভাঙ্গাবে। সে কি এতো নিষ্ঠুর হতে পারবে? না, তাকে নিষ্ঠুর হতেই হবে–চরম নিষ্ঠুর। ঔষধ আর চেক–আপ রিপোর্ট সে লুকিয়ে রাখে। এগুলো সালমার চোখে পড়া চলবে না।

কিছুক্ষণ পরেই তরফদার প্রকাশনীর মালিক সিরাজুল আলম সাহেব এসে আজাদের রুমে প্রবেশ করতে করতে বললেন–কি ব্যাপার আজাদ ভাই, এত তাড়াতাড়ি আসতে বললেন যে, আজকে অফিসে যাননি নাকি?

হ্যাঁ ভাই শরীরটা ভালো নেই। এ জন্যে যেতে না পেরে আপনাকেই কষ্ট দিয়েছি। বেয়াদবি মাফ করবেন সিরাজ ভাই, শরীর ভালো থাকলে আপনাকে কষ্ট দিতাম না।

সে কি! মাফ চাওয়ার কি হলো, এটা আমাদের ব্যবসা। ব্যবসার খাতিরে কত লেখকদের কাছে আমাদের যেতে হয়, আর আপনার বই–এর যা চাহিদা আপনার ডাকে না এসে পারি ভাই?

যে জন্যে ডেকেছি তাহলো– আমার বই–এর সমস্ত স্বত্ব আমি আমার ভাতিজা রুমীর নামে লিখে দিচ্ছি। আর আমার বাড়ির ঠিকানাও দিয়ে দিচ্ছি আপনি সমস্ত টাকা পয়সা এখন থেকে ওর নামেই পাঠিয়ে দিবেন।

কেন, আপনি ঢাকায় থাকবেন না?

না ভাই, চাকরি ছেড়ে দিয়েছি, কয়েক দিনের মধ্যেই দেশে চলে যাবো। খান কয়েক উপন্যাস আছে ওগুলো রেডী করে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েই চলে যাবো।

আপনি ঢাকায় থাকলে ভালো হতো।

আল্লাহর ইচ্ছা হলে আবার আসবো। বলেই আজাদ চা তৈরি করতে যায়। বলে– চা খেয়ে যান সিরাজ ভাই।

না, না, আমি চা খাবো না। আপনি কষ্ট করবেন না। বিশ্রাম নিন। আচ্ছা আমি আসি আজাদ ভাই। বলেই সিরাজ সাহেব চলে যান। তরফদার প্রকাশনীর মালিক সিরাজ সাহেবের মুখে বিশ্রামের কথা শুনে আজাদের মুখে করুণ বিষন্ন হাঁসি ফুটে ওঠে। হ্যাঁ সে বিশ্রামই নেবে–জীবনের শেষ বিশ্রাম। এমন এক অন্ধকার ঘরে সে বিশ্রাম নেবে যেখানে পৃথিবীর কোন কোলাহল তার প্রগাঢ় বিশ্রামে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে না। আজাদ গুণ গুণ করে গান গাইতে থাকে–

আমার যখন ফুরাবে দিন আসবে গহীন রাতি
থেকো প্রভু সে জীবনে হয়ে চির সাথী।
আসবে গহীন রাতি।

গাইতে গাইতে দরোজার দিকে তাকাতেই দেখে সালমা অনেকগুলো ফুল হাতে নিয়ে দরোজায় দাঁড়িয়ে আছে। মুখে নেকাব নেই–আছে লজ্জা রাঙা স্নিগ্ধ হাসি। আজাদ গান থামিয়ে কেমন এক অনাসক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে।

সালমা রুমে প্রবেশ করতে করতে বলে–থামলে কেন আজাদ ভাইয়া? গাও। অনুনয় ঝরে পড়ছে ওর কণ্ঠে।

এই গানটার ক্যাসেট তোমার কাছে আছে। বাড়িতে গিয়ে শুনে নিও।

ওটাতো নকল–খাটি নয়।

নকল! মানে?

নকল নয়তো কি, তোমার গলা থেকে রেকর্ডে, সেখানে থেকে ক্যাসেটে তার পর কানে।

আজাদ সালমার কথা শুনে হাসতে থাকে। সালমা হাতের ফুলগুলো টেবিলে ফুলদানীতে সাজায়। আজাদ জিজ্ঞাসা করে ফুল দিয়ে কি হবে সালমা?

পুষ্প বাসর হবে। সালমার গোলাপী অধরে মৃদু হাসি। আজাদ আবার বলে–পুষ্প বাসর বিলাসকুঞ্জে হয়, সেখানে হৃদয়ের মিলন নেই। ওখানে বিলাস সঙ্গীনিদের মানায় ভালো। ওর কথায় সালমা হেসে ওঠে। বলে–বাগান থেকে এত যত্ন করে তোমার জন্যে ফুল নিয়ে আসলাম আর তুমি আমাকে বিলাস সঙ্গীনি বানিয়ে দিলে?

মাত্র কয়েকটি ফুল আনলে সালমা? প্রতিদিন কত হাজার ফুল ফোটে। কত ফুল ফোটে গভীর অরণ্যে মানুষের দৃষ্টির আড়ালে। যে গুলো মানুষের ভালো লাগে–মন কেড়ে নেয় সে ফুল দিয়ে সুখের বাসর সাজায়– প্রণয় প্রণয়ীনি মালা গাঁথে, ধনীর প্রাসাদে ফুলদানীতে শোভা পায়। আর যেগুলো গভীর অরণ্যে ফোটে মানুষের চোখে পড়ে না–

সেগুলো কি হয় আজাদ ভাইয়া?

ঝরে যায়। আজাদ বিষণ্ন দৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে বলতে থাকে–গভীর অরণ্যে মানব চক্ষুর অন্তরালে সে ফুল ফোটে আপন সৌরভ দিগন্তে ছড়িয়ে দিয়ে এক সময় শুকিয়ে তার পাঁপড়ীগুলো ধূলো মলিন হয়ে পড়ে। কেউ তার খোঁজ রাখে না।

তোমার কথাগুলোর মধ্যে কোথায় যেন বেদনা হাহাকার করছে, কান্নার ধ্বনি শোনা যাচ্ছে আজাদ ভাইয়া।

কান্নাতেই মানুষের হৃদয় কলুষমুক্ত হয় সালমা। আমাদের আদি পিতা আদম (আঃ) অনুতপ্তে আর কান্নায় আল্লাহর ক্ষমা লাভ করেছিলেন।

তোমার কথা ঠিক, কিন্তু হাসিরও প্রয়োজন আছে।

অস্বীকার করছি না কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয়। যেমন উত্তপ্ত মরু প্রান্তরে ফুলের বাগান আশা করা বৃথা।

আমি মরু প্রান্তরে নেই–ঝর্ণা ধারার পাশেই আছি।

কখন থেকে সালমা?

বড় ভাবী তোমাকে কি কিছু বলেনি?

বলেছে, কিন্তু আমি তোমার গলায় সোনার শিকল আশা করি সালমা–যা আমার কাছে নেই।

আমি লোহার শিকল পরতে পারবো আজাদ ভাইয়া। সালমার চোখ দুটো করুণ হয়ে উঠে।

লোহার শিকল খুব ভারী হয়–শ্বাস বন্ধ হয়ে আসবে।

কেন, কেন তুমি এত দুর্বল হচ্ছো আজাদ ভাইয়া। তুমি কাছে থাকলে আমি সব ভার বইতে পারবো।

সালমার চোখ থেকে ঝর ঝঃ করে পানি পড়ছে। আজাদ দেখছে, ওর চোখের পানির প্রতিটি ফোটা আজাদের হৃদয়ে শেল হয়ে বিঁধছে, কিন্তু সে তো নিরূপায়। ভোরের আলো ফোটার পূর্বেই তো সে ঝরে যাচ্ছে। দেহে তার মরণ ব্যাধি আপার বাসা বেঁধেছে। কি করে সে এ অবস্থায় একটা মেয়ের পবিত্র প্রেমের সাথে প্রতারণা করবে? না, সে আরো আঘাত করবে সালমাকে, আঘাতে আঘাতে সালমার হৃদয় দীর্ণ বিদীর্ণ করে দিবে।

আজাদ বলে– মানুষ বড় অসহায় সালমা। মানুষের জীবনে যে মধু আছে তা পুরাতন হয়ে গেলে বিষে পরিণত হয়।

তুমি আমার কাছে কোন দিন বিষ হবে না, কালের ব্যবধানে মধু থেকে অমৃত হয়ে উঠবে।

প্রসঙ্গ পালটিয়ে আজাদ বলে–আমি একটু বাইরে যাবো সালমা।

তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছো আজাদ ভাইয়া? যেন আর্তনাদ করে ওঠে সে।

না না, এসব তুমি কি বলছো সালমা!

দেখো, আমি কচি খুকী নই। বড় ভাবী গতকাল তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে, তারপর আজকে তোমার ব্যবহার সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে, বলো–কেন? তুমি যদি এমনই করবে ......

আর বলতে পারে না সালমা। কান্নায় কণ্ঠ যেন বন্ধ হয়ে গেছে। সে তাড়াতাড়ি মুখের নেকাব টেনে ঝড়ের বেগে রুম থেকে বের হয়ে যায়। আজাদ আর সহ্য করতে পারে না, হাতুড়ী দিয়ে অন্য লোহাকে আঘাত করতে থাকলে হাতুড়ীও এক সময় উত্তপ্ত হয়ে উঠে। আজাদও সালমাকে আঘাত করতে করতে যেন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। অদম্য কান্নায় সে ভেঙ্গে পড়ে। চোখের পানিতে সালমার দেওয়া বালিশ সিক্ত হয়ে ওঠে।

মাগরিবের আযান পড়তেই সে শয্যা ছেড়ে উঠে অজু করে নামাজ আদায় করে। গভীর মনোযোগ দিয়ে, বিনয়াবনত চিত্তে নিঃশিম একাগ্রতায় সে নামাজ আদায় করে। মহান আল্লাহর অদৃশ্য পদপ্রান্তে আজাদ লুটিয়ে পড়ে–আর, আর একটু সময় দাও প্রভু। জীবনের

শেষ কাজ রুমীর জন্যে কিছু করে যাওয়া আর সালমাদের দানের প্রতিদান দেওয়া। এগুলো শেষ করার মত সময় ও শক্তি দাও আল্লাহ।

গভীর নিস্তব্ধ নিঝুম নিশীথে সালমার দেওয়া উপহার কোরান তেলোয়াত করে ওর জন্যে দোয়া করে আজাদ। ভাবতে থাকে—আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নেয়ামত মানব জীবনে আল কোরান, সেই কোরানই তাকে উপহার দিয়েছে সালমা। আর আজ তার হৃদয় ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে সে নিরুপায় হয়ে। সালমাকে পাবার পথ যখন নিষ্কন্টক হলো আর তখনই তার জীবন প্রদীপ ঝড়ো হাওয়ায় নিভে যাচ্ছে। আজাদের চোখ থেকে পানি ঝরতে থাকে।

আঘাত, নিষ্ঠুর আঘাত সে করেছে সালমাকে। এত বড় আঘাত কি না করলে হতো না? সালমা যতখানি তার জীবনে এসেছে এতখানি নিবিড় হয়ে কোন মেয়ে আসে না। আজাদের নিষ্ঠুর প্রত্যাখান কি সালমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে তার আপন স্বর্ণ সিংহাসনে? না না ওকে যেতে হবে– যেতেই হবে ওর আপন সাম্রাজ্যে। যেখানে ও হবে একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী।

আজ পাঁচ দিন হয়ে গেল সালমা আজাদের মেসে আসেনি। না, আসুক, ও ভুলে যাক আজাদকে। তাকে ভুলে যাবার জন্যেই তো সে নির্মম ভাবে সালমার কোমল হৃদয় রক্তাক্ত করে দিয়েছে। সে রক্ত ক্ষরণ বোধহয় এখনো বন্ধ হয়নি।

সতের

আজাদ ইতিমধ্যে অসমাপ্ত কয়েকটি উপন্যাস সমাপ্ত করে বাংলাবাজার তরফদার প্রকাশনীর মালিক সিরাজুল আলম সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেয়। এ উপন্যাসগুলো সালমা, ওর আব্বা ও আম্মার নামে উৎসর্গ করা। শেষ, তার ঢাকার কাজ শেষ। এখানে আর নয়। সালমা আর আসে না। আনন্দ হচ্ছে ওর! হ্যাঁ আনন্দই তো। একে বলে আত্মঘাতি আনন্দ বিলাস।

আগামী কালই সে ঢাকা ছেড়ে চলে যাবে। শহরের কোলাহল ছেড়ে নির্জন পল্লীতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। হ্যাঁ সে ঘুমিয়েই পড়বে, অখন্ড ঘুম। তাই ভাবী আর, আর সালমা যদি কোনদিন জানতে পারে তাহলে ওদের শত চিৎকারেও ওর ঘুম ভাঙবেনা। ওদের ডাকে সে সাড়া দেবেনা। আজাদ শুষ্ক কণ্ঠে আবৃত্তি করতে থাকে–

সবকিছু ছেড়ে যদি তোমার আগেই চলে যাই তুমি কেঁদোনা,
জীবনের ওপারেও আমি তবো পথ চেয়ে রবো তুমি ভেবোনা।
মনটাকে বুঝিয়েছি কতো করে,
আসবে গো আসবে সে নিশি ভোরে
রাতটা না হয় গেল একা যাক না।
যেদিন রবো না আমি, তুমি শূন্য সমাধি মোর ফুল দলে ছেয়ে দিও না।

ফজরের নামাজ আদায় করে আজাদ আবার শুয়ে পড়ে, ভাবতে থাকে বাড়িতে যাবার সাথে সাথেই তো ভাইয়া আর ভাবী ওকে চেপে ধরবে কেন সে সবকিছু ছেড়ে বাড়িতে চলে এলো। সব কিছু জানিয়ে পত্র লেখতে চেয়েছিল। কিন্তু আগাম দুঃখ পাবে মনে করে আজাদ পত্র লেখেনি। যেয়ে মুখেই সে সব বলবে। মায়ের রক্ত তার দেহে, মা–ও অকালে চলে গেছে সে–ও মায়েরই পথ অনুসরণ করছে।

আজাদ ভাই, দরোজাটা খুলবে?

কে? কার কণ্ঠ, সালমা! সালমা এসেছে। আজাদ তাড়াতাড়ি উঠে দরোজা খুলে দিয়ে ছালাম দেয়। সে আশ্চর্য হয়ে যায় এতো সকালে সালমাকে দেখে। ব্যগ্র কণ্ঠে জানতে চায়– সালমা তুমি?

হ্যাঁ এলাম, আমি কি আসতে পারি না তোমার কাছে? না কি সে অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছো?

কিন্তু এতো সকালে!

তোমার কাছে আসতে কি নির্দিষ্ট সময়ের প্রয়োজন আজাদ ভাইয়া?

না, না, তা কেন? তবে শশীর উদয় নিশিতেই হয়।

দিনেও তো চাঁদ দেখা যায় আজাদ ভাইয়া।

হ্যাঁ, দেখা যায়। কিন্তু আলো থাকেনা।

তোমার সাথে তর্কে পারবো না, চলো বাইরে চলো।

কোথায় যাবো সালমা?

আবার কেন জিজ্ঞাসা করা আজাদ ভাইয়া, যাবার পথ যদি এক হয় তাহলে জিজ্ঞাসা করার অধিকার থাকেনা।

হ্যাঁ, সে একই পথ হতে হবে ইসলামের সুষমায় আবৃত, কোরানের আলোয় আলোকিত মহা মুক্তির মিলন পথ।

তুমি দেখতে পাবে আমি কোরানের পথেই চলছি।

আমি দোয়া করি সে পথে তোমার যাত্রা আমৃত্যু হোক।

কিন্তু নাস্তা হয়নি যে এখনো।

নাস্তা আমি এনেছি, এখন জামা কাপড় পরে চলো।

আজাদ জামা কাপড় পরে নামতে থাকে আর ভাবতে থাকে এ বেলা আর যাওয়া হবে না, বিকেলের দিকেই যেতে হবে। আজও সে কি আঘাত করবে? সালমাকে বলবে তুমি ফিরে যাও সালমা! তোমার স্বপ্নের ফুল মরণ ক্ষতে আক্রান্ত, এ ফুলে আর ঘ্রাণ নেই। না, না, এ সব বলা যাবে না। তাহলে সালমা তাকে বৃথাই দেশ বিদেশে নিয়ে চিকিৎসা করাবে। অযথা অর্থ ব্যয় করবে। সে শুধু শুধু টাকা খরচ করতে দেবে না। তার চেয়ে সে স্পষ্ট বলবে সালমাকে সে বিয়ে করতে পারবে না।

গাড়িতে বসে সালমা জিজ্ঞাসা করে– ফোন করেছিলাম তোমার অফিসে, ওরা বললো– তুমি নাকি চাকরি ছেড়ে দিয়েছো।

হ্যাঁ, একটু নীরবে লিখতে চাই।

লিখতে চাও ভালো। কিন্তু আমাকে তো কিছুই জানালে না। আর তোমার শরীরটাই বা ভেঙ্গে যাচ্ছে কেন?

সব কথা আজকাল মনে থাকে না সালমা, আর প্রয়োজন বোধ করিনি তাই বলিনি।

আমাকে জানানোর প্রয়োজন বোধ করনি? আচ্ছা বেশ। বলে সালমা গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। আজাদও মৌন যেন ধ্যানস্থ সাধক। ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে সাভার স্মৃতি সৌধের দিকে যায়। সালমার কোন আদেশ না পেয়ে গাড়ি ঘুড়িয়ে আবার মগবাজারের দিকে আসতে থাকে। আগেও এরকম অনেক দিন হয়েছে। সালমা কিছু না বললে ড্রাইভার বেশ কিছুক্ষণ আপনমনেই এদিক ওদিক ফাঁকা জায়গায় গাড়ি ঘুরিয়ে মগবাজার মেসের সামনে এসে থামে। তখন নীরবতা কাটিয়ে সালমা বলে ওঠে– জানিনা সেদিন থেকে কেন তুমি আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছো? পায়ে যে ফুল এসে পড়েছে তাকে দলিত মথিত করে যেওনা। বাইরের দিকে সালমার দৃষ্টি।

না সালমা দলিত মথিত করতে চাইনা, স্বযত্নে পাশ কাটাতে চাই।

তুমি দ্রাক্ষাফলের রস দিয়ে তৈরি কালির যে আলপনা আমার হৃদয়ে এঁকেছো তা মোছা যাবে না আজাদ ভাইয়া। তোমার হাতের স্বাক্ষর মুছে ফেলা যাচ্ছেনা। যে কালিতে স্বাক্ষর দিয়েছো তা দ্রাক্ষা ফলের জীবন রক্ত, শত শত বছর ওর দাগ থাকে। আজাদকে মেসের সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল সালমা। আজাদ স্পষ্ট দেখলো গাড়ির আরোহীনি ঐ প্রেমময়ীর চোখ থেকে পানি ঝরছে। সে রুমে এসে স্পন্দনহীনের মতই শয্যায় পড়ে ভাবতে লাগলো সত্যিই অমোছনীয় দ্রাক্ষার কালি। সে দেখেছে প্রাচীন পুঁথি দ্রাক্ষার কালিতে লিখা। শত বছরের পুরাতন পুঁথি আজো উজ্জ্বল অমলিন। মুছে না গেলেও পুঁথি পুরাতন হয়ে যায়। অপাঠ্য না হোক দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায়। তখন তাকে আলমারীর কোন কোণায় ফেলে রাখতে হয়। উই আর ইঁদুরের খাদ্যে খেলার সামগ্রীতে পরিণত হয়। কেউ খোঁজ নেয় না–নিতে চায় না।

আজাদ উঠে ছাদে এলো। সালমাকে ছেড়ে যাওয়ার প্রচন্ড ব্যথায় এক অসহনীয় যন্ত্রণায় হৃদয়ের তন্ত্রীগুলো যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। আজই তাকে প্রেম নিলয় অভিসারের পুষ্প উদ্যান সুখের বাসর ত্যাগ করে চলে যেতে হবে চিরতরে। সালমার হৃদয়ে আজাদের স্বাক্ষর যতই উজ্জ্বল হোক পুরানা পুঁথির মতই তাকে অপাঠ্য হবার সুযোগ দিয়ে যাবে সে। আর তার হৃদয়ে সালমা যে ছবি অংকন করেছে সে ছবি তো কোন দিন ধূসর হবে না। আকাশের নক্ষত্রের মতই উজ্জ্বল, কালের করাল গ্রাসে কোন দিন এ বিরহের আগুন নিভে যাবে না। বুক খানা দু' হাতে চেপে ধরে আজাদ। আগুন, বুকে বিরহের আগুন লোলুপ জিহবা বিস্তার করছে। এ আগুন নির্বাপিত করার শীতল সরোবর ঐ সালমা। কিন্তু সে নিজের হাতেই আজ ঐ শীতল স্নিগ্ধ অমীয় বারিধারায় আবর্জনা ছুঁড়ে দিয়েছে। ওর বেহেশ্‌তী প্রেমের ফুলের পাঁপড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করেছে সে নিজের হাতেই।

না, আর নয়। মেঘে মেঘে বেলা অনেক হয়ে গিয়েছে। আজই সে চলে যাবে। কিন্তু সালমার দেয়া জামা কাপড় রুমের জিনিসপত্র না সে কিছুই নেবেনা। সব ফেলে যাবে। হৃদয়ের অমূল্য প্রেমই যখন সে ফেলে যাচ্ছে, সেখানে এ সব নিয়ে কি হবে। সালমাকে কি শেষ বারের মত একটা ফোন করবে? ওর কণ্ঠ শেষ বারের মত শুনতে বড়ই ইচ্ছে করছে। নাহ্ থাক। কি হবে মিথ্যে বিড়ম্বনা বাড়িয়ে। একটা চিঠি লেখে যাবে। আজাদ দ্রুত কাগজ কলম নিয়ে সালমাকে উদ্দেশ্য করে একটা চিঠি লেখে বিছানার উপরে রাখে। ওর বিশ্বাস সালমা আবার আসবেই। সমস্ত কিছু রেখে শুধু নিজের কেনা জামা কাপড়গুলো নিয়ে আজাদ রুম থেকে বের হয়ে আসতেই আবার ফিরে রুমের দিকে তাকায়। সালমার হাতের–তার প্রাণ প্রেয়সীর হাতের সাজানো ঘর, সে চিরতরে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। চোখ দু'টো কেমন যেন জ্বালা করে ওঠে। তার যৌবনের উষা লগ্নে যে প্রেমময়ী চাঁদের মতই আলো ছড়িয়েছিল– মরণ ব্যাধি ক্যান্সার মেঘ হয়ে এসে তার উপরে আবরণ দিয়ে অন্ধকার করে দিল।

আজাদ আর দাঁড়ায় না। নেমে এসে স্কুটার নিয়ে গাবতলী এসে বাসে উঠে বসে।

আঠার

বাস সম্মুখে ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে। আজাদ তার রোগাক্লিষ্ট শরীরটা বাসের ছিটের সঙ্গে হেলিয়ে দিয়ে ভাবছে। সালমা। তারই সালমা তার অনুক্ষণের সঙ্গিনী ছিল। সে আজ পিছনে পড়ে রইলো। আজাদ যে কেন নিরূপায় সালমাকে জানানো হলো না। কেউ জানে না। জানে শুধু সে আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। সালমা ভাববে ভীরু আজাদ পালিয়ে গেল। তার প্রেমের সুধা ধারণ করার মত পাত্র আজাদের নেই। তাই সে ওর প্রেমের অপমান করে গেল। সে কাপুরুষ, দুর্বল অ-প্রেমিক। ভাবুক গে, কোন উপায় নেই নিজেকে প্রেমিক প্রমাণ করার। ওকে অকৃতজ্ঞই ভাবুক সালমা। সে সুখী হোক, কোন ধনীর দুলালের ঘর প্রভাময় করে তুলুক। আজাদের চোখে পানি আসছে। না, ওকে দুর্বল হলে চলবে না। সে সালমার হৃদয়পটে স্থায়ী কালিতে স্বাক্ষর দিয়ে থাক না কেন, সে স্বাক্ষরকে মুছতে না পারলেও ধূসর হতে দিতেই হবে। সালমার আকাশে আজাদ নামক মেঘ সরে যাক। সেখানে পূর্ণচন্দ্রের উজ্জ্বলতা নিয়ে উদয় হোক পূর্ণানন্দের অমিয় সুধাকর। সালমা কিছুই জানবে না ওর সম্পর্কে, না জানাই ভালো। অকৃতজ্ঞ আর প্রেমের অবমাননাকারী ভেবে ও ওর হৃদয়পট থেকে আজাদের নাম মুছে দিক।

হ্যাঁ রে সালমা, আজাদ কি ঢাকায় নেই? কোন সংবাদই যে দিচ্ছে না? বড় ভাবী জিজ্ঞাসা করেন সালমাকে।

কি জানি, আমি তো আর যাওয়ার সময় পাই না।

আজাদের কাছে যাওয়ার সময় হয়না, বলিস কি?

পড়া নিয়ে এত ব্যস্ত আছি যে, কোথাও যাওয়ার সময় নেই। সালমার বলার ধরণ দেখে বড় ভাবী বুঝতে পারেন কোন কারণে ও আজাদের সাথে অভিমান করেছে। তিনি বললেন- আজকে ওকে আসতে বলে ফোন করনা।

যে অফিসে ফোন সেখানে চাকরিও ছেড়ে দিয়েছে।

চাকরি ছেড়ে দিয়েছে! তাহলে করছে কি?

লেখা-লেখি, বই লিখছে। বলেই সালমা বড় ভাবীর সামনে থেকে সরে গিয়ে আজাদ যে রুমটায় ছিল ওদের বাড়িতে সে রুমে প্রবেশ করলো। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আজাদের পরিত্যাক্ত শয্যার দিকে তাকিয়ে থাকলো। নিজের অজান্তেই চোখ থেকে ফোটায় ফোটায় পানি ঝরছে। দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে সালমা পত্র লিখতে বসলো-

প্রিয় আজাদ,

আমার ছালাম নিও। ভাই-ভাবীকে আমার ছালাম দিও। আদরের রুমীর প্রতি রইলো দোয়া। আশা করি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের করুণাতে কুশলেই আছ। অকস্মাৎ অতর্কিতে আমাকে প্রত্যাখান করার পিছনে কারণ যা-ই থাক আমি অনুসন্ধান করবো। পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের বন্ধন রজ্জুটা চোখে দেখা না গেলেও ওদের প্রেমের সততা মলিন হয় না আজাদ। সূর্যে কি পরিমাণ তাপ আছে আর কতই বা দূরে সে পৃথিবী না-ই বা জানলো। ওর আলো আর উত্তাপে পৃথিবী ফলে ফুলে বনবিথীকায় পরিপূর্ণ হচ্ছে এটাই পৃথিবীর জন্যে যথেষ্ট নয় কি? তুমি আমাকে জীবন সঙ্গীনি করতে পারবেনা, সে কথা আমাকে বলার পিছনে যে কারণ, তাহলো তুমি ভয় পেয়েছো। আমার মত ধনীর দুলালী বোধহয় তোমার ঘর করতে পারবে না। কিন্তু আমি তো তোমার জীর্ণ কুঠিরে প্রবেশ করার জন্যে পা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম আজাদ। তুমি যে আমাকে সত্যই ভালোবাসো তার প্রমাণ আমাকে প্রত্যাখ্যান করা। তুমি চিন্তা করেছো আমার স্থান জীর্ণ কুঠিরে নয়-রাজ প্রাসাদে। তাই রাজ প্রাসাদে পাঠানোর জন্যে তোমার নামটা আমার স্মৃতি থেকে মুছে দিতে চাইছো। কিন্তু যা দ্রাক্ষা ফল দিয়ে তৈরি কালিতে লেখা তা কি মুছে যায়, না মলিন হয়?

আমার প্রেম যদি সত্য হয় তাহলে আমার কাছে তোমাকে ফিরে আসতেই হবে। আর এ জীবনে তোমাকে না পাই পরকালে নিশ্চয়ই পাবো। কারণ আমার প্রেম বৈধ পথেই চলেছে, এতে কোন কলুষ কালিমার স্পর্শ ঘটেনি। আজাদ ভাইয়া, ক্যাসেট আমার বড়ই অপছন্দ ছিল। এখন পছন্দ করি। কারণ ওতে তোমার গান বাজে। তুমি নেই,কিন্তু তোমার কণ্ঠ আমি প্রাণ ভরে শুনি। তোমার কণ্ঠে কোরান শুনতে খুব ইচ্ছে করে। আমার এ স্বপ্ন কবে সফল হবে আজাদ? তোমার দেখানো পথ-ইসলামের মহা মুক্তির পথেই আমি চলেছি, দোয়া করো পা পিছলে পড়ে যেন না যাই।

তোমারই সালমা।

চিঠি লেখা শেষ করে একটা খামে ভরে ভাবতে-থাকে পত্র কি সে পোষ্ট করে দিবে না ওর মেসে গিয়ে আজাদের অজান্তে রুমে দিয়ে আসবে? রুমেই দিয়ে আসবে। সালমা বোরখা পরে গিয়ে গাড়িতে ওঠে বলে ড্রাইভারকে– মগবাজার। ওর নিজের কাছে রক্ষিত চাবি দিয়ে রুমে প্রবেশ করতেই বিছানার উপরের পত্রটা তার চোখে পড়ে। দ্রুত সে পত্রটা নিয়ে পড়তে থাকে–

সালমা,

জানি তুমি আমাকে অকৃতজ্ঞ প্রতারক ভাববে। কিন্তু আমি নিরুপায়। আল্লাহ জানেন, আমি তোমাকে কতটুকু ভালোবেসেছি। কিন্তু নিজের অজান্তে যে বাধার বিন্ধ্যাচল আমার সামনে দাঁড়িয়ে গেছে তা অতিক্রম করে তোমার হাতে হাত রাখা সম্ভব নয়-তাই চলে গেলাম। আখেরাতের ময়দানে ইন্‌শাল্লাহ দেখা হবে।

তোমারই আজাদ।

চিঠিটা হাতে নিয়ে সে পাথরের মত বসে থাকে। আজাদ চলে গেছে! তার প্রেমকে নির্মমতাবে পদদলিত করে চলে গেছে! কিন্তু কেন? সে বাধার কথা লিখেছে, কি সেই বাধা? যা সালমার স্বপ্ন সৌধকে ভেঙ্গে ধূলিস্মাৎ করে দিল! তার জীবনকে অভিশপ্ত করে তুললো! সালমা জানবে, তাকে জানতেই হবে কি সেই বাধা। সে মাতালের মত টলতে টলতে গিয়ে গাড়িতে বসে। মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা। মনে হচ্ছে সমস্ত তন্ত্রীগুলো যেন এক সাথে ব্যথার ঝড় তুলেছে। গাড়ি প্রফেসরস্ বুক কর্ণারের সামনে দিয়ে যেতেই সালমার কানে ভেসে আসে আজাদের কন্ঠের গান–

ও নীড় ভেসে গেছে চোখের নীরে---

গাড়ি থামাও–সালমার কণ্ঠ ঝংকার দিয়ে ওঠে। ড্রাইভার গাড়ি থামাতেই সে দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে প্রফেসরস্ বুক কর্ণারের সামনে গিয়ে সেলসম্যান সাদীকে গভীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করে-আজাদ নোমানীর নতুন ক্যাসেট বেরিয়েছে? সাদী টেপ রেকর্ডারের আওয়াজ কমিয়ে দিয়ে কিছু বলতে যেতেই ক্যাসে বসা আমিন সাহেব বলে ওঠেন–জ্বী আপা, বেরিয়েছে। সব তো প্রায় শেষ হয়ে এলো?

দু'এক কপি কিছুই নেই? সালমার কণ্ঠে করুণ আবেদন।

তা আছে, দিচ্ছি। এই সাদী, আজাদ নোমানীর নতুন গানের ক্যাসেট দাও। আমিন সাহেব সেলসম্যান সাদীকে বললেন– বাজিয়ে দিও।

সাদী ক্যাসেট বাজাতে লাগলো, সালমা শুনছে তন্ময় হয়ে। কোথায় আছে সালমা? ধূলীর ধরণীতে না মহাশূন্যে! দোকানের সামনে অনেক লোক। সবাই শুনছে গান। আজাদের প্রাণস্পর্শী চিত্তাকর্ষক মরমীয় ইসলামী সঙ্গীত। সালমার কোন দিকে লক্ষ্য নেই।

সে যেন নিজের অস্তিত্ব ভুলে গেছে। নির্বাক নিস্পন্দ পাথরের মতই দাঁড়িয়ে আছে সালমা। বোরখার নেকাবের আড়ালে তার মুখচ্ছবি যে কি করুণ ভাব প্রকাশ করছে কে জানে।

আমিন ভাই, এই যে আজাদ নোমানীর নতুন আরো তিন খানা নতুন বই বেরিয়েছে, অল্প কয়েক দিনের মধ্যে বাকীগুলোও বের হবে। তরফদার প্রকাশনীর মালিক সিরাজুল আলম সাহেব প্রফেসরস বুক কর্ণারে প্রবেশ করতে করতে বললেন।

আজাদ নোমানীর বই এতো দেরী করে দেন কেন? পাঠকেরা বড়ই বিরক্ত করে। আমিন সাহেব বললেন। আজাদের নাম কানে যেতেই সালমা যেন সম্বিত ফিরে পেলো।

বললো–দেখি দেখি কি উপন্যাস বেরিয়েছে!

সিরাজ সাহেব নমুনা হিসেবে যে কয়খানা বই এনেছিলেন তা সালমার দিকে বাড়িয়ে দিতেই ও যেন এক প্রকার ছিনিয়েই নিলো বইগুলো। দ্রুত পৃষ্ঠা উল্টাচ্ছে সালমা। ওর নামে আর ওর আব্বা আম্মার নামে উৎসর্গ করা বইগুলো। সালমা বইগুলো আর দুটো ক্যাসেট নিয়ে ব্যাগে রাখতেই আমিন সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন–কিছু মনে করবেন না আপা, আপনার আগ্রহ দেখে মনে হচ্ছে আজাদ নোমানী আপনার বিশেষ কোন আত্মীয়?

আত্মীয়! হ্যাঁ আত্মীয়ই, আত্মার আত্মীয়। বলেই দাম চুকিয়ে দিয়ে গাড়িতে গিয়ে ড্রাইভারকে বললো–বোটানিক্যাল গার্ডেনে চলো।

সালমার কথা শুনে সিরাজ সাহেব আমিন সাহেব আর সাদী পরস্পরে মুখ চাওয়া চাওয়ি করলো। সিরাজ সাহেব বললো হাসতে হাসতে– শুনলেন আমিন ভাই, আত্মার আত্মীয় মানে আপনারজন।

ও লেখক কবি সাহিত্যিক গায়কদের তো কতোজনই ভালোবাসে। সে রকমই হবে, হয়ত। আমিন সাহেব কথাগুলো বলেই টাকা গুণতে থাকেন।

সালমা বোটানিক্যাল গার্ডেনের পশ্চিম দিকের বটগাছের নীচে গিয়ে দাঁড়ায়। অনেক দিন পূর্বে সে আজাদের সাথে এখানে এসে দাঁড়িয়ে কতো কথাই না বলেছিল। আজ কোথায় তার আজাদ। চোখ দু'টো জ্বালা করে ওঠে সালমার। সে তাড়াতাড়ি গার্ডেন থেকে বের হয়ে এসে পথে পোষ্ট বক্সে তার লেখা চিঠি আজাদের বাড়ির ঠিকানায় পোষ্ট করে দিয়ে বাড়িতে চলে আসে।

কোথায় যাবে সে? কোথাও ভালো লাগছে না। পৃথিবীর এতো রূপ সবই তার কাছে বিবর্ণ লাগছে। বিকালে সে বুড়ীগঙ্গা ব্রীজের দিকে গেল। ব্রীজের উপরে দাঁড়িয়ে নদীর দিকে সে তাকিয়ে আছে উদাস দৃষ্টি মেলে। সালমার ভাই শাকিলের বন্ধু জাফর ব্রীজের উপর দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলো। সালমার প্রতি ওর বিশেষ দৃষ্টি অনেক দিন থেকেই ছিল। একবার বিয়ের প্রস্তাবও দিয়েছিল শাকিলের কাছে। শাকিল বলেছিল, সালমা যাকে পছন্দ করবে তার সাথেই ওরা ওকে বিয়ে দেবে। ব্রীজের উপরে আজ সালমাকে নিসঙ্গ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জাফর গাড়ি ব্রেক করে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে নামতে নামতে সে বলে–কি দেখছো সালমা একা একা এখানে দাঁড়িয়ে?

ঘটনার আকস্মিকতা সামলে নিয়ে সালমা বলে– দেখছিলাম সূর্য যখন অস্ত যায় তখন পৃথিবী হাসে না বিরহে কেঁদে অশ্রু ঝরায়। হাসলো সালমা, ম্লান হাসি।

কি দেখলে কাঁদে নিশ্চয়ই?

না কাঁদে না, হাসে। কারণ পৃথিবীর প্রেম এমনই সত্য যে সূর্যকে আবার আগামীকাল নতুন রূপে আসতেই হয়–

তা ঠিক, কিন্তু এর পিছনে থাকে রাত্রির সুদীর্ঘ সাধনা।

সূর্য আর পৃথিবীর প্রেম আছে বলেই তো সাধনার প্রয়োজন। সাধনা না থাকলে বন্ধন দৃঢ় হয় না।

আচ্ছা এবার চলো কোন রেষ্টুরেন্টে গিয়ে চা খাই।

না, ধন্যবাদ। রেষ্টুরেন্টের আলো জ্বলা অন্ধকারে গিয়ে আমি গোধূলী লগ্ন হারাতে চাই না।

গোধূলী কিন্তু মিলনের লগ্ন– জাফর হাসতে থাকে।

শুধু মিলনের কথাই ভেবেছেন দেখছি, গোধূলী বিরহেরও লগ্ন। পৃথিবীর বিরহ, আকাশের বিরহ, এই সন্ধ্যারাগ বিরহেরও মহা বিষাদ সিন্ধু।

আচ্ছা আসি জাফর ভাই, মাগরিবের সময় হয়ে এলো।

গাড়িতে আসতে আসতে সালমা ভাবতে থাকে–

রাতের নিকষ কালো অন্ধকার ক্রমশ আলোকিত পৃথিবীর উপরে আবরণ টেনে দিচ্ছে। আজাদও তার প্রভাময় জীবনে অন্ধকারের আচ্ছাদন টেনে দিয়ে চলে গেছে। যে সুখ নীড় সে রচনা করেছিল তা চোখের নীরে ভেসে গেছে। এ গানটা তাহলে আজাদ কি তাকে কেন্দ্র করেই গেয়েছে?

ঐ নীড় ভেসে গেছে চোখের নীরে।

না না, তা কেন করবে? ওর সমস্ত গানই তো স্রষ্টার সাথে গভীর প্রেমের বিরহের গান। সালমার সুখের বাসর যে সুখের আশায় রচিত করেছিল তা অনলে পুড়ে গেল।

উনিশ

আজাদ ধীর পায়ে বাড়িতে প্রবেশ করতেই ভাবী নাছিমার মুখোমুখি হয়। ভাবীকে সে ছালাম জানায়। নাছিমা আজাদকে দেখে ভূত দেখার মতই চমকে উঠে। একি চেহারা আজাদের! উজ্জ্বল ফর্সা রং এর বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য কোথায় হারিয়ে গেছে! পাণ্ডু বর্ণ চেহারা। চোখ দু'টো কোঠরাগত। যেন আলোহীন নিষ্প্রভ দৃষ্টি। মাথার চুল উস্কোখুস্কো। গোটা মুখে যেন মৃত্যুর কালো আবরণ। আজাদ দুর্বল পায়ে এগিয়ে এসে নাছিমার কদমবুসি করতেই নাছিমা যেন আর্তনাদ করে উঠে– আজাদ এ কি, এ কি হয়েছে তোর?

কই কিছু হয়নি তো ভাবী, কিছুই হয়নি। কান্নায় যেন আজাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। আজাদের কণ্ঠস্বর শুনে ঘরের মধ্যে থেকে শফিক বলে ওঠে– কে নাছিমা, আজাদ এসেছে? কই আজাদ এখানে আয় ভাই। আজাদের পিছে পিছে নাছিমাও ঘরে প্রবেশ করে। শফিকও আজাদকে দেখে যেন চমকে ওঠে। বলে– এ কি চেহারা হয়েছে তোর! ডাক্তার দেখাসনি?

দেখিয়েছি ভাইয়া, কিছু দিন বিশ্রাম নিতে বলেছে।

কই কাগজপত্র দেখি?

আগে গোছল সেরে ভাত খেয়েনি, সারারাত গাড়িতে– শরীরটা ভালো লাগছে না।

খেতে পারলো না আজাদ।

কয়েক লোকমা মুখে দিতেই বমি হয়ে গেল। নাছিমা চিৎকার করে উঠলো– কি হয়েছে তোর ভাই? ঝর ঝর করে পানি পড়ছে চোখ থেকে।

আজাদ তার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো। ব্যথা, প্রচণ্ড ব্যথা বুকে, মাথায় সর্ব শরীরে। মনে মনে বলে– আল্লাহ্ তোমার ফয়সালাতেই যেন সন্তুষ্ট থাকতে পারি এই তৌফিক আমাকে দাও।

শফিক ক্রাচে ভর দিয়ে আজাদের ঘরে প্রবেশ করে। পিছনে নাছিমা, রুমী অবাক চোখে যেন সব কিছু দেখছে। প্রতিবার ছোট চাচা ওর জন্যে কত কি আনে, ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করে। এবার কিছুই আনেনি। এসে জড়িয়েও ধরেনি। শফিক আজাদের পাশে বসতেই নাছিমা আজাদের ব্রিফকেস থেকে মেডিক্যাল চেক–আপের সমস্ত রিপোর্ট স্বামীর হাতে দিয়ে উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে থাকে। সব কাগজপত্র পড়া শেষ করে শফিক নির্বাক নিস্তব্ধ স্পন্দনহীনের মতই পাথর চোখে আজাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। নাছিমা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বার বার জানতে চায় কি হয়েছে, কি হয়েছে আমার আজাদের? শফিক কোন জবাব না দিয়ে ধীরে ধীরে আজাদের মাথার কাছে সরে গিয়ে দু'হাতে ছোট শিশুর মত ছোট ভায়ের মাথা বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে শুষ্ক কণ্ঠে বলে– এ কত দিন হয়েছে আজাদ? প্রশ্নটা গলায় আটকে যাচ্ছে।

বেশ কিছুদিন ধরেই বুঝতে পারছি।

তখুনি আমাকে জানালি না কেন?

লাভ নেই ভাইয়া, এর চিকিৎসা সম্ভব না।

তবুও আমি ভিটে মাটি বেচে তোকে চিকিৎসা করাতাম, একি করলি তুই আজাদ? আমার পা নেই চোখ দুটোও যে অন্ধ হয়ে যাবে তুই না থাকলে। দু'ভায়ের চোখের অশ্রু একাকার হয়ে যাচ্ছে।

না, ভাইয়া না। আজাদ করুণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে ওঠে। ঐ সামান্য জায়গা জমি না থাকলে রুমী কোথায় দাঁড়াবে। আর তোমার মুখেই তো শুনেছি আব্বা আমাদের আম্মাকে আমেরিকা পর্যন্ত নিয়ে গিয়েও কিছু করতে পারেনি, মৃত্যু এসে–শফিক আজাদের মুখে হাত চাপা দিয়ে যেন চিৎকার করে ওঠে– ও কথা বলিস না আজাদ ও কথা মুখে আনিস না।

নাছিমার কাছে এবার যেন সব পরিষ্কার হয়ে যায়– ক্যান্সার! তার শাশুরীও তো ক্যান্সারেই গেছে। তাহলে আজাদ– তার আজাদ! সেই তিন বছর বয়স থেকে কতো কষ্ট করে সে এত বড় করেছে। সেও আজ তার শাশুড়ীর পথ ধরেছে! একি, একি হলো আল্লাহ? বলে নাছিমা আজাদের বিছানায় লুটিয়ে পড়ে। শফিক আবার বলে–আজাদ তুই যে আমার শুধু ছোট ভাই–ই না। সেই ছোট বেলায় মা হারিয়ে গেল, তোর ভাবী তখন নতুন এসেছে, আমরা দু'জনে কত কষ্ট করে তোকে মানুষ করেছি–তুই যে আমার সন্তানের মত–

অদম্য অশ্রুর স্রোতধারা যেন প্রবাহিত হচ্ছে শফিক আর নাছিমার চোখ থেকে।

মঈন চাচা কি কিছু জানে আজাদ? নিরস কণ্ঠ শফিকের।

না ভাইয়া, ওদেরকে জানালে ওরা আমার পিছনে অঢেল অর্থ ব্যয় করবে, শুধু শুধুই টাকা খরচ হবে।

তবুও তুই ওদের কাছে ছিলি, একটা খবর দেয়া দরকার। কয়েকদিন পর একটা টেলিগ্রাম করে দেব। আজাদ শফিকের কথায় শুধু করুণ ভাবে চেয়ে থাকে, কোন জবাব দেয় না।

কয়েক দিন পর সালমার পত্র আসে। আজাদের আর শক্তি নাই পত্র খুলে পড়ার। ক্ষীণ কণ্ঠে নাছিমাকে বলে–ভাবী, তুমিই পড়ো।

নাছিমা জোরে জোরে পত্র পড়ে–আজাদের দু'চোখের পাশ দিয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ে বালিশ ভিজে যাচ্ছে। নাছিমা আঁচলে চোখ মুছে বলে–এই হতভাগীটা কে আজাদ?

মঈন চাচার ছোট মেয়ে সালমা–আরো দু' ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো চোখ থেকে।

চিঠি পড়ে তো মনে হয় ও কিছুই জানে না।

না ভাবী ওকে জানাই নি। জানালে আমেরিকা নিয়ে যেতো, কিন্তু কোন লাভ হতো না।

তুই যে কোরান শরিফটা রোজ পড়িস, ওটা বোধ হয় ওরই দেওয়া?

হ্যাঁ ভাবী, ওরই দেওয়া। ওর অন্তর থেকে নিঃশব্দে মুছে যাবো আমি। ও বে
ভাগ্যবানের সাথে সুখের বাসরে রাত অতিবাহিত করবে। আমার অন্তরের অব্যক্ত যন্ত্রণা
কোনদিন জানতে পারবে না। সে জন্যই ওদের কাউকে কিছুই না বলে নীরবে চলে এসে
একটু পানি দাও ভাবী। এতগুলো কথা এক সাথে বলে আজাদ হাঁফিয়ে উঠে। না
চোখের পানি আড়াল করে গ্লাস তুলে ধরে আজাদের মুখে।

শফিক আর দোকানে যায় না। নিঃশব্দে বাইরের ঘরটায় বসে থাকে। পিওন আজা
বই আর ক্যাসেটের রয়্যালিটির টাকা দিয়ে যায়। কোন রকমে সে শুধু কম্পিত হাতে দস্ত
দেয়। টাকাগুলো বিছানাতেই পড়ে থাকে। আজাদের কাছে গিয়ে বলে–তুই হারিয়ে দি
নিজেকে শেষ করে দিয়ে রুমীর জন্যে এতো টাকার ব্যবস্থা করে গেলি আজাদ? তোর
টাকাগুলো যে আমার বুকে শেল হয়ে বিঁধছে। আজাদকে জড়িয়ে ধরে নীরবে অশ্রু
করতে থাকে শফিক। টেলিগ্রাম পাঠায় শফিক সালমার আব্বা মঈন চৌধুরীর কাছে।

বিশ

গভীর রাত। সালমা তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করে আল্লাহর কাছে দোয়া করছে। রাব্বুল আলামিন, আমি তোমার এক অধম পাপী বান্দী, জানিনা আমার কোন অপরাধে আজাদকে আমার কাছে থেকে দূরে নিয়ে গেলে। যা কিছুই হোকনা কেন আমি যেন সব সইতে পারি এমন শক্তি আমাকে তুমি দাও। আজাদের উছিলায় আমি তোমার পথ চিনতে পেরেছি। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যেন তোমার বিধান অনুযায়ী চলতে পারি। আমি তোমার রহমতের প্রত্যাশীনি, তুমি আমার উপরে রহমত করো।আজাদ যেখানেই থাক ওকে তুমি ভালো রেখো। আমার দোয়া তুমি কবুল করো আল্লাহ। আমিন ছুম্মা আমিন।

পরদিন সকালে বেলা দশটার দিকে সালমা প্রফেসর'স বুক কর্ণারে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নেয়, কোন নতুন বই বের হলে সে কিনবে। নীচে আসতেই সে দেখে আব্বা কি যেন একটা কাগজ গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ছে, সালমা জিজ্ঞাসা করে কি পড়ছো আব্বু এতো মনোযোগ দিয়ে?

মঈন চৌধুরী মুখে কোন কথা না বলে গম্ভীর মুখে নীরবে সালমার দিকে কাগজটা বাড়িয়ে দেন। হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিয়ে পড়েই সালমা স্থান কাল পাত্র ভুলে চিৎকার করে উঠে– আমি যাবো, এখুনি যাবো, আজাদ এভাবে মরতে পারে না। সালমার কান্নার আওয়াজে দোতলা থেকে সবাই নীচে আসে। টেলিগ্রাম পড়ে বড়ভাবী অশ্রুসজল নয়নে ক্রন্দরত সালমাকে জড়িয়ে ধরে।

তোমরা সবাই তাড়াতাড়ি রেডি হও, এখুনি আজাদদের বাড়িতে যেতে হবে, ওকে আমি এভাবে মরতে দিবোনা। যত টাকা লাগে আমি চিকিৎসা করাবো, যা মা সালমা রেডি হয়ে আয়, আমি ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলি।

কত বছর পূর্বে তিনি এই গ্রাম ছেড়ে গিয়েছিলেন, কোনদিন কল্পনাও করেননি আবার তাকে এই গ্রামের মাটিতে পা রাখতে হবে। মঈন চৌধুরী মনে মনে ভাবতে থাকেন। নিয়তি তাকে আবার এই গ্রামে টেনে নিয়ে আসবে, তা তিনি স্বপ্নেও কোনদিন ভাবেন নি। শেখ পাড়া গ্রাম তিনি যখন ছেড়ে যান তখন বিদ্যুৎ হীন গ্রামকে রাতে মনে হতো কোন এক ভূতুড়ে গ্রাম। গা ছম ছম করা পরিবেশ। আজ কত পরিবর্তন। সেই ঘন গাছ পালা আর নেই। তার বদলে বাড়ি ঘর ঘন হয়েছে। পল্লী বিদ্যুতায়ন হয়েছে। আগের পায়ে চলা সরু রাস্তাগুলো মাটি দিয়ে ভরাট করে চওড়া সড়কে পরিণত করা হয়েছে। ঢাকা থেকে নিজের দু'খানা গাড়িতে করে মঈন চৌধুরী, স্ত্রী, কন্যা সালমা ও পুত্র বধূদের নিয়ে শেখপাড়া যখন পৌছালেন তখন রাত্রি প্রায় দশটা। পথে সালমা বার বার ব্যকুল কণ্ঠে জানতে চেয়েছে আব্বা, আর কত দূর? আজাদদের বাড়ি থেকে সামান্য ব্যবধানে গাড়ি রেখে ওরা নামলো। বাড়ির

গেটে গাড়ি যায় না। যাওয়ার মত রাস্তা নেই। শুক্লো পক্ষ চলছে যদিও তবু আকাশে টুকরো টুকরো সাদাকালো মেঘ নরম তুলোর মত বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে। মেঘমুক্ত চাঁদের আলোয় পথ ঘাট আলোকিত। আজাদের ভাইয়া মাস কয়েক পূর্বেই ছোট ভায়ের দেওয়া টাকায় বাড়িতে বিদ্যুৎ নিয়েছে। ওরা সবাই আজাদদের বাড়ির দিকে দ্রুত পা চালালো। চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় সালমার শরীরে কালো বোরখার উপরে সোনালী জরীর ফুলগুলো চিক চিক করছে।

একুশ

আজ সকাল থেকেই আজাদের অবস্থার বেশি অবনতি ঘটেছে। সারাদিন সে কিছুই মুখে দিতে পারেনি। মাঝে মধ্যে যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করছে। দাঁতে দাঁত চেপে শরীরের যন্ত্রণা সহ্য করার চেষ্টা করছে। বিছানায় শায়িত আজাদের দিকে তাকালে মনে হচ্ছে যেন একটি জীবন্ত কংকাল–চর্মা আবৃত একটি জীবন্ত কংকাল পড়ে আছে। গত কয়েকদিন ধরেই সে শুয়ে শুয়ে ইশারায় নামাজ আদায় করেছে। ভাবীকে ডেকে বলেছে রুমীকে একটু কোরান তেলাওয়াত করতে বলো ভাবী, ওর মিষ্টি কণ্ঠে আল্লাহর বাণী শুনলে আমার রোগ যন্ত্রণা দূর হয়ে যায়। রুমী কোরান পড়েছে আর আজাদের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছে। ভাবীকে বলেছে, বড় ইচ্ছে ছিল ভাবী আব্বা আমার নামে আর এক খতম কোরান পড়বো। কিন্তু সে সুযোগ আর হলো না। আছরের নামাজ ঈশারায় আদায় করে ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকে– রুমী আব্বু–

এই তো ছোট চাচা আমি তোমার কাছেই আছি।

ঐ গানটা এক বার গাও না আব্বু।

কোনটা ছোট চাচা?

ঐ যে তোকে শিখিয়েছিলাম আমার যখন ফুরাবে ....

আচ্ছা, আমি গাচ্ছি তুমি শোন। রুমী গাইতে থাকে–

আমার যখন ফুরাবে দিন আসবে গহীন রাতি
তখন আমার কেউ রবে না, প্রভু হয়ো তুমি সাথী
আসবে গহীন রাতি।

গানের আওয়াজে নাছিমা দৌড়ে এসে ছেলের মুখে হাত চাপা দিয়ে বলেন– চুপ কর চুপ কর রুমী এ গান বন্ধ কর।

কেন ভাবী গাইতে দাও না– আজাদের কণ্ঠে সীমাহীন অনুনয়।

তুমি সুস্থ হয়ে এ গান শুনবে– নাছিমার চোখ থেকে পানি ঝরতে থাকে। ভাবীর মুখে সুস্থ হওয়ার কথা শুনে আজাদের শুষ্ক অধরে যেন এক চিলতে বিদ্রূপের হাসি ফুটে ওঠে। ভাবে হায়রে নারী! এখনো আশা!

এশার নামাজের পর থেকেই আজাদের কথা অস্পষ্ট হয়ে যায়। ধীরে ধীরে নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে মৃত্যুর হীম শীতল বাহু এগিয়ে আসছে আজাদের দিকে। বাড়ির সবাই আজাদকে ঘিরে বসে আছে। মাঝে মাঝে নাছিমা আঁচল দিয়ে নিজের চোখ মুছে আজাদের মুখে মিষ্টি পানি দিচ্ছে। আজাদ সবার দিকে অশ্রু সজল চোখে তাকাচ্ছে। ঠোট দু'টো নেড়ে অস্পষ্টভাবে কি যেন বলছে বোঝা যাচ্ছে না। শফিক এতক্ষণ পাথর চোখে আজাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ সে টেবিল থেকে সালমার দেয়া কোরান শরিফটি নিয়ে সূরা ইয়াছিন বের করে বলে– আজাদ, ভাইয়া আমার, শোন। বলেই তেলাওয়াত করতে শুরু করলো।

শফিকের কণ্ঠে আল্লাহর কোরান যেন গোটা বাড়িটায় এক বেহশ্তী আবেশে ভরপুর করে দিয়েছে। রাতের মহা নিরবতা বিদীর্ণ করে শফিকের কণ্ঠ আল্লাহর বাণী ছড়িয়ে দিচ্ছে।

বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করতেই সালমাদের কানে কোরানের মধুর আওয়াজ যায়। ওদের সবার মন যেন কুহু ডাক ডেকে ওঠে। সালমা মুখের নেকাব সরিয়ে কোরানের আওয়াজ লক্ষ্য করে এগিয়ে গিয়ে ঘরের দরোজায় দাঁড়ায়। আজাদ বোবা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায়। দুর্বল হাতটা সামান্য একটু উঁচু করে সালমার দিকে বোধহয় বাড়িয়ে দিতে চায় সে। হাতটা বিছানায় নেতিয়ে পড়ে। সেই সাথে আজাদের মাথা টাও এক দিকে হেলে পড়ে যায়। ঠোঁট দু'টো কাঁপছে– কালেমা তৈয়বা পাঠের কম্পন।

আজাদ? নাছিমা আর্ত কণ্ঠে ডেকেই মূক হয়ে গেল। আর ঐ আর্তকণ্ঠের আঘাতেই শফিকের কোরান পড়াও থেমে যায়।

সালমা ছুটে এসে আজাদের শরীরের উপরে আছড়ে পড়ে। বলতে থাকে আজাদ আমি এসেছি, আমি এসেছি। আমাকে ছেড়ে যেওনা। কথা বলো– কথা বলো। কতো দিন তোমার কথা শুনিনি। একটি বার আমাকে সালমা বলে ডাকো। নীরব স্পন্দন হীন হয়ে গেল সালমার বিরহ কাতর শরীর। ও জ্ঞান হারিয়েছে। রুমী উঠানে দাঁড়িয়ে আকাশের চাঁদের দিকে সজল চোখে তাকিয়ে ছিল। একখন্ড ঘন কালো মেঘ কোথা থেকে এসে পূর্নিমার পূর্ণ চাঁদের উপরে আবরণ টেনে দিল। পৃথিবী অন্ধকার শুধুই অন্ধকার।

সমাপ্ত